বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম. এ.

তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই/DSE (বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব) - ৩০১

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষার ইতিহাস

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক বাণীরঞ্জন দে — বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডিএসই/DSE : ৩০১

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষার ইতিহাস

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক–১ : পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহ

একক–২ : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ

একক–৩ : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ (শ্রেণি বিভাগ, ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র, গুরুত্ব)

একক–৪ : ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাজন, নির্দশন, ও বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা (বৈশিষ্ট্য ও রূপান্তর)

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক–৫ : বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা

একক–৬ : প্রাচ্য গোষ্ঠীর ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা

একক–৭ : অসমিয়া ওড়িয়ার সহদরা হিসেবে বাংলা ভাষা

একক–৮ : কলকাতা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের ভাষা

পর্যায় গ্রন্থ ৩

একক–৯ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক পর্ব)

একক–১০ : বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

একক–১১ : তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

একক–১২ : অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও বাহ্যপুনর্গঠন

পর্যায় গ্রন্থ ৪

একক–১৩ : উপভাষা

একক–১৪ : উপভাষা চর্চার ইতিহাস

একক–১৫ : উপভাষা সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপভাষা জরিপ

একক–১৬ : ভাষাঋণ

সূচিপত্র

তৃতীয় পত্র

ডিএসই/DSE : ৩০১

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ডিএসই: ৩০১	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহ	১-৮
	২	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ	৯-১১
	৩	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ (শ্রেণি বিভাগ, ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র, গুরুত্ব)	১২-২৫
	৪	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাজন, নির্দশন, ও বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা (বৈশিষ্ট্য ও রূপান্তর)	২৬-৪০
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা	৪১-৪৩
	৬	অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা	প্রাচ্য গোষ্ঠীর ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা	৪৪-৪৮
	৭	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	অসমিয়া ওড়িয়ার সহদরা হিসেবে বাংলা ভাষা	৪৯-৫২
	৮	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	কলকাতা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের ভাষা	৫৩-৬৪
পর্যায় গ্রন্থ : ৩	৯	অধ্যাপক বাণীরঞ্জন দে	ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক পর্ব)	৬৫-৭১
	১০	অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস	বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান	৭২-৯৪
	১১	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান	৯৫-১০৬
	১২	অধ্যাপক বাণীরঞ্জন দে	অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও বাহ্যপুনর্গঠন	১০৭-১১৩
পর্যায় গ্রন্থ : ৪	১৩	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	উপভাষা	১১৪-১১৬
	১৪	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	উপভাষা চর্চার ইতিহাস	১১৭-১২০
	১৫	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	উপভাষা সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপভাষা জরিপ	১২১-১২৪
	১৬	অধ্যাপক বাণীরঞ্জন দে	ভাষাঋণ	১২৫-১৩২

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ১

পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহ

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.১.১.১ : উৎস ও শ্রেণিবিভাগ

৩০১.১.১.২ : ভাষাবংশ সমূহের বিশ্লেষণ

৩০১.১.১.২.১ : প্রস্তাবনা

৩০১.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.১.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.১.১.১ : পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহের উৎস ও শ্রেণিবিভাগ

ভাষা মানুষের পরম সম্পদ। এই ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবের আদানপ্রদান ঘটায়। সারা পৃথিবীতে মোট ভাষার সংখ্যা প্রায় ছয় থেকে সাত হাজারের মতো। তবে সঠিক সংখ্যা কত তা বলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর এই সমস্ত ভাষাকে তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে (শব্দ, ধাতুরূপ ও ধ্বনিরূপ) বিভাজিত করা হয়। যেমন— অশ্রেণিবদ্ধ ভাষা ও শ্রেণিবদ্ধ ভাষা।

পৃথিবীর যে সমস্ত ভাষার মধ্যে শব্দ, শব্দভাণ্ডার, ধ্বনিরূপ, ধাতুরূপগত সাদৃশ্য থাকে তাদের শ্রেণিবদ্ধ ভাষা বলা হয়। আর অশ্রেণিবদ্ধ ভাষাগুলির মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই।

শ্রেণিবদ্ধ ভাষাগুলিকে বেশ কিছু ভাষাবংশে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European)

(খ) সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic)

(গ) বান্টু (Bantu)

(ঘ) ফিন্নো-উগ্রীয়/উরালীয় (Finno-ugrian)

(ঙ) তুর্ক-মঙ্গল-মাঞ্চু (Turko-Mongol-Manchu)

(চ) দ্রাবিড় (Dravidian)

(ছ) অস্ট্রিক (Austick)

(জ) ভোট চিনীয় (Tibetan-Chinese)

(ঝ) ককেশীয় (Cucasian)

(ঞ) উত্তর পূর্ব-সীমান্তীয় (Hyperborean)

(ট) এসকিমো (Eskimo)

(ঠ) আমেরিকার আদিম ভাষা (American Indian Language)

এ ছাড়াও কিছু অপ্রধান ভাষাবংশ আছে। সেগুলি হল—

ক. লা-তি (La-ti)

খ. পাপুয়ান (Papuan)

গ. আন্দামানী (Andamani)

ঘ. তাসমানি (Tasmanian)

ঙ. বুশম্যান, হটেনটন্ট ইত্যাদি।

৩০১.১.১.২ : ভাষাবংশ সমূহের বিশ্লেষণ :

ইন্দো-ইউরোপীয় :

৩০১.১.১.২.১ : প্রস্তাবনা :

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইন্দো-ইউরোপীয়। শুধু ভৌগোলিক বিস্তারেই নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এই ভাষাবংশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্যলাভ করেছে। বৈদিক সংহিতার মন্ত্র, রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসি, কালিদাসের কাব্য নাটকাদি, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি। তাছাড়া আধুনিক ভাষার মধ্যে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই অন্তর্গত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে কতগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষা রূপান্তরিত হয়েছে।

যে মূলভাষা থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের উদ্ভব, তা এখনও জানা যায়নি। কারণ মূলভাষাটি বিলুপ্ত। তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন ভাষাগুলি বিশ্লেষণ করলে মূলভাষার স্বরূপ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া এই ভাষাবংশের আদি পীঠস্থান সম্পর্কে দুটি মতও প্রচলিত আছে। জানা যায় আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য ইউরোপে। অনেকে বলেন দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের

পাদদেশে। এই ভাষাবংশের ভাষাভাষী মূলজাতি এখান থেকে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অনুমান করা হয় ২৫০০ খ্রি: পূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে মূলভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম হয়েছিল।

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোনও প্রমাণ বা লিখিত নিদর্শন নেই। প্রধানত তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায় এর একটি যুক্তিসিদ্ধ আনুমানিক ভাষা কাঠামো গড়ে তোলা যায়।

মনে রাখতে হবে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারে আছে দুটি প্রধান ভাগ। যথা—

ক. পশ্চিমী ভাগ বা কেন্তুম বর্গ

খ. পূর্ব ভাগ বা সতম্ বর্গ।

পশ্চিম ভাগের ভাষাগুলিতে ১০০ সংখ্যাটিকে কেন্তুম বা মেন্ত শব্দ থেকে উৎপন্ন কোনও শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়। আর সতম বর্গের ভাষাগুলিতে সতম্ বা তদজাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেন্তুম বর্গে আছে জার্মানিক, গ্রীক, কেলতিক, রোমানিক ইত্যাদি ভাষাগুচ্ছ। আর সতম বর্গের ভাষাগুচ্ছের উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলি হল — আর্মেনীয়, আলবেনীয়, বালতো স্লাভিক, ইন্দো-ইরানীয় ইত্যাদি। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুচ্ছের একটি প্রধান ভাষা প্রাচীন ইরানীয় ভাষা—আবেস্তান, মধ্য ইরানীয় ভাষা ও নব্য ইরানীয় ভাষা। ইরানীয় শাখার অন্য কতগুলি ভাষাও আছে। যেমন — তাজিক, পুশতু, আজার-বাইজানীয় ইত্যাদি ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য বা পালি, প্রাকৃত-অপভ্রংশ, অবহট্ট ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি (মারাঠি, সিন্ধি, পঞ্জাবি, হিন্দি) ইন্দো-ইরানীয় থেকেই সৃষ্ট। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষাগুলি হল গ্রিক, সংস্কৃত, লাতিন, গথিক ইত্যাদি। পৃথিবীর প্রাচীনতম নিদর্শন 'ঋগ্বেদ সংহিতা' ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই প্রাচীন নিদর্শন বলে অনেকে মনে করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। পৃথিবীর উন্নততর ভাষাগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকেই উদ্ভুত। আনুমানিক ২৫০০ খ্রি: পূর্বাব্দে দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে এই ভাষার জন্ম। এই ভাষাবংশ থেকে জাত অনেকগুলি আধুনিক ভাষা। যেমন—ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইটালীয়, রুশীয়, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি। এই সমস্ত ভাষার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি বিস্ময়কর। এ ছাড়াও এই ভাষাবংশের মানুষেরা বর্তমানে পৃথিবীতে সংখ্যায় বেশি। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ও উন্নত।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারকে কতকগুলি ভাষার সমন্বয় হিসেবে ধরা হয়। এই পরিবারের ভাষাগুলি এশিয়া থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত এক বিশাল স্থানে ছড়িয়ে আছে মোটামুটি দশটি শাখায় বিভক্ত হয়ে এবং এইগুলিই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভাষার জন্ম দিয়েছে। এই পরিবারের সদস্য হল— (ক) গ্রীক (খ) জার্মানিক (গ) লাতিনিক (ঘ) বাল্‌তো-স্লাভিক গোষ্ঠী (ঙ) কেল্‌টিক (চ) তুখারীয়

(ছ) আরমেনীয় (জ) আলবেনীয় (ঝ) ইন্দো-হিট্টীয় (ঞ) ইন্দো-ইরানীয়। তবে এই ইন্দো-ইরানীয় শাখা থেকেই উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষাগুলির আত্মপ্রকাশ।

মনে রাখতে হবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারে আছে দুটি প্রধান ভাগ। যথা— (১) পশ্চিমী ভাগ বা কেন্তুম বর্গ ও (২) পূর্ব ভাগ বা সতম্ বর্গ। পশ্চিমী ভাগের ভাষাগুলিতে ১০০ সংখ্যাটিকে কেন্তুম বা সেন্ত শব্দ থেকে উৎপন্ন কোনও শব্দ দিয়ে বোঝানো হয় আর সতম বর্গের ভাষাগুলিতে এক্ষেত্রে সতম বা তদ্জাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেন্তুম বর্গের ভাষাগুচ্ছের মধ্যে আছে জার্মানিক, রোমানিক, কেলতিক ও গ্রীক ভাষাসমূহ। আর সতম বর্গের ভাষাগুচ্ছে আছে বালতো-স্লাভিক, আর্মেনিয়, আলবেনীয় ও ইন্দো-ইরানীয়। এই ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুলিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ভাষা বলা হয়। এই গুচ্ছের একটি প্রধান ভাষা হল প্রাচীন ইরানীয় ভাষা আবেস্তান, মধ্য ইরানীয় ভাষা বা পেহলবী ও নব্য ইরানীয় ভাষা বা পারসিয়ান। ইরানীয় শাখার অন্য ভাষাগুলি হল তাজিক, পুশতু, আজার-বাইজানীয় ইত্যাদি। ইন্দো-ইরানীয় থেকে সৃষ্টি অন্য প্রধান ভাষাগুচ্ছের নাম প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক, মধ্য-ভারতীয় আর্য বা পালি, প্রাকৃত-অপভ্রংশ অবহট্ট ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি হল মারাঠি, সিন্ধি, পঞ্জাবি, হিন্দি, উর্দু ইত্যাদি।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা হল গ্রীক, সংস্কৃত, লাতিন, গথিক ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন এই বংশের প্রাচীন ভাষায় পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ 'ঋকবেদ সংহিতা' রচিত।

সেমীয়-হামীয় :

পশ্চিম এশিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষা পরিবার হল সেমীয়-হামীয়। এর দুটি শাখা-সেমীয় ও হামীয়। সেমীয় ভাষাগুচ্ছের প্রধান প্রধান ভাষা হল হিব্রু ও আরবি। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট লেখা হয় হিব্রুতে। মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত আরবি ভাষা। হামীয় ভাষাগুচ্ছের প্রধান ভাষা 'মিশরী'। বর্তমানে লুপ্তভাষা বলা চলে।

অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ এই সেমীয়-হামীয় ভাষা পরিবারটিকে স্বতন্ত্র বংশে ধরে থাকেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের পর এই ভাষা বংশের কথাই বেশি আলোচিত। এই ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার উত্তর অংশের নানা স্থানে প্রচলিত থাকায় এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'এ্যাফ্রো-এশীয়' ভাষা।

বান্টু :

দক্ষিণ আফ্রিকার দুটি প্রধান ভাষা হল জুলু ও বান্টু। আফ্রিকার যেখানে সেমীয়-হামীয় ভাষা প্রচলিত নয়, সেখানে বান্টু ভাষাই প্রচলিত। এই ভাষার গোষ্ঠীভুক্ত উপভাষার সংখ্যা অনেক। অনেকে মনে করেন জুলু ও বান্টু ভাষাগুচ্ছেরই অন্তর্ভুক্ত ভাষা সোয়াহিলি, কাফির, লুবা ইত্যাদি।

ফিন্নো-উগ্রীয় :

ইউরোপে আরও একটি ভাষা পরিবারের ভাষা ব্যবহৃত। এই পরিবারটির নাম ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষা পরিবার। এর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি হল ফিনল্যান্ডের ভাষা ল্যাপ, ফিন্নীয়, এস্তোনিয়ার ভাষা এস্থোনীয়ান ও হাঙ্গেরীর ভাষা হাঙ্গেরীয় ইত্যাদি। এই ভাষাগুলি উরাল ভাষা নামেও পরিচিত।

তুর্ক-মঙ্গল-মাঞ্চু :

মধ্য এশিয়ার তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু ভাষা পরিবার বিস্তৃত। এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষা তুর্ক ভাষা। এই ভাষা তুরস্কের জগতাই, মধ্য এশিয়ায় কিরাগজস্থান, উজবেকিস্থান অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। মোঙ্গলিয়ার কিছু অংশে প্রচলিত মোঙ্গল ভাষা ও মাঞ্চুরিয়ায় প্রচলিত মাঞ্চু ভাষা এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষা পরিবারকে একসঙ্গে 'উরাল-আলতাই' ভাষাগোষ্ঠীও বলা হয়। তবে এই ভাষা পরিবারের তুর্কী ভাষা 'ওসমানলি' সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হলেও মঙ্গোলিয়ার খুব অল্পসংখ্যক লোকই 'মঙ্গল' ভাষা ব্যবহার করে। আর 'মাঞ্চু' ভাষার ব্যাপকতা শুধু মাঞ্চুরিয়া ও সাইবেরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

দ্রাবিড় :

দ্রাবিড় ভাষা দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা পরিবার। এর মধ্যে প্রধান চারটি অনার্য ভাষা তামিল, তেলেগু, কানাড়ি ও মালায়ালম। এই পরিবারের ছোটো ভাষাগুলি হল টুলু, টুডু ও কুড্‌গু। সিংহল ও উত্তরাপথের দু-একটি স্থানে এই দ্রাবিড় ভাষাগুচ্ছের প্রচলন আছে। বেলুচিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে 'ব্রাহুই' ভাষাও এই পরিবারের অন্তর্গত। এ ছাড়া ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব রয়েছে।

অস্ট্রিক :

দক্ষিণ এশিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া পর্যন্ত ছড়ানো আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা পরিবারকে বলা হয় অস্ট্রিক ভাষা পরিবার। এই বংশের দুটি শাখা (ক) অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও (খ) অস্ট্রোনেসীয়া।

অস্ট্রো-এশিয়াটিকের আবার দুই শাখা— (১) মোন্-খমের ও (২) কোল মুণ্ডা। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগুলির একটি প্রধান ভাষা খাসিয়া। এটি মেঘালয় রাজ্যের প্রধান ভাষা। আর মুণ্ডিক শাখার ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডা ও হো এই শাখারই গুরুত্বপূর্ণ।

অস্ট্রোনেসিয়ান ভাষাগুলিও দুই শাখায় বিভক্ত। যথা — মেলানেশিয়ান ও মালয়োপলিনেশিয়ান। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে মালয়োপলিনেশিয়ান ভাষাগুচ্ছের ভাষাগুলি অবস্থিত। আর মালয়োপলিনেশিয়ান ভাষাগুলি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে অবস্থিত। নিউজিল্যান্ডের আদিম উপজাতি মাওরিদের ভাষাও অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

ভোট চিনীয় :

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের পরপরই নাম করতে হয় ভোট চিনীয় ভাষা পরিবারের। ভাষাবিজ্ঞানে এই পরিবারটিকে বলা হয় সিয়ামিজ-চাইনিজ ভাষা। এই পরিবারের তিনিটি শাখার ভাষাগুলি হল—চিনের চিনীয় ভাষা, শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের সিয়ামিজ ভাষা ও ভারতে প্রচলিত তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠীর বর্মী ভাষা। তবে প্রথম শাখার চিনা ভাষাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভাষা। হিমালয়ের পাদদেশে প্রচলিত লেপ্‌চা, গারো, নাগা, কুকি প্রভৃতি ভাষা ভোট চিনীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত।

ককেশীয় :

ককেশাস পর্বতমালার আশেপাশের ভাষাগুলিকে বলা হয় ককেশীয় ভাষা। এই পরিবারের ভাষাগুলি ছোট ছোট ভাষাগুচ্ছের পরিবার। অনেকে বলেন কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ককেশীয় ভাষা প্রচলিত। এই পরিবারের প্রধান ভাষার নাম জর্জিয়ান।

উত্তরপূর্ব সীমান্তীয় :

বেরিং প্রণালীর আশেপাশে বরফঢাকা উত্তর-পূর্বে হাইপারসবোরিয়ান বা উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এই ভাষা পরিবারটি অবস্থিত। এদের মধ্যে প্রধান ভাষা হল চুচকি ভাষা। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের খুব কম সংখ্যক লোকই এই ভাষায় কথা বলে।

এসকিমো :

চির তুষারাবৃত উত্তর পশ্চিমে ও উত্তর কানাডা, গ্রিনল্যান্ড, উত্তর স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও উত্তর রুশ দেশের মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলি 'এসকিমো' ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। বলা যায় গ্রিনল্যান্ড থেকে আলেউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ভূভাগে এস্‌কিমো বংশের ভাষাগুলির বিচরণ ক্ষেত্র।

আমেরিকার আদিম ভাষা :

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাসমূহ এই ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। জানা যায়, আগে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের একটি নির্দিষ্ট ভাষা ছিল। কিন্তু তাদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষা লুপ্ত হয়েছে। তবে ওই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এখনও যারা টিকে আছে, সেই আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাগুলি এই ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলিকে এককথায় বলা হয় আমেরি ইন্ডিয়ান ভাষা পরিবার। এই পরিবারের সদস্য ভাষাগুচ্ছকে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা —

(১) আলগংকীয়ান (Algonquian)

(২) আথাবাসকান (Athabascan)

(৩) ইরোকোয়ীয়ান (Iroquoian)

(৪) মুসকোজীয়ান (Muskogean)

(৫) সিওউয়ান (Siouan)

(৬) পিমান (Piman)

(৭) শোশোনীয়ান (Shoshonean)

(৮) নাহুয়াটলান (Nanhuatlan)

এদের মধ্যে নাহুয়াটলান ভাষার অন্তর্গত ছিল প্রাচীন মেকসিকোর সুউন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষা আজটেক। এই সমস্ত ভাষার মধ্যে কিন্তু অনেক ব্যবধান ছিল। যেমন — দক্ষিণ আমেরিকার উন্নত-সংস্কৃতির বাহক ইনকারদের ভাষার সঙ্গে আজটেকদের ভাষার কোনোরকম মিল ছিল না।

উপরের সমস্ত ভাষা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক অশ্রেণিবদ্ধ ভাষাও ছিল। যেমন — ইতালির ভাষা এট্রুস্কান। প্রাচীন কালের ভাষাবিজ্ঞানীরা সাদৃশ্যের অভাবে জাপান, কোরীয়, বাস্ক, বুশম্যান ও হটেন্‌টট ইত্যাদি ভাষাকেও অশ্রেণিবদ্ধ ভাষা বলেছিলেন।

যাই হোক ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলিকে প্রধানত চারটি পরিবারে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ

২। দ্রাবিড় পরিবারের ভাষাসমূহ

৩। অস্ট্রিক পরিবারের ভাষাসমূহ

৪। তিব্বতী-বর্মী ভাষাগুচ্ছের ভাষাসমূহ।

তিব্বতী-বর্মী ভাষাগুচ্ছটি উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা রাজ্যে বসববাসকারী মানুষদের মধ্যে প্রচলিত। এই গুচ্ছে ছোট ছোট অনেক ভাষা আছে, যার মধ্যে প্রধান হল তিব্বতী ভাষা ও মণিপুরী ভাষা। তবে তিব্বতীবর্মী ভাষাগুচ্ছ আসলে সিয়ামিজ চাইনিজ ভাষা পরিবারের অন্তর্গত।

তবে ভাষার এই বংশানুগত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিভাগ আছে। এক্ষেত্রে ভাষাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা — (১) অসমব্যয়ী বা আইসোলেটিং ও সমবায়ী বা নন আইসোলেটিং। অসমবায়ী শ্রেণির ভাষা হল চিনীয় ভাষা। আবার সমবায়ী ভাষা তিন রকমের। যথা — সর্বসমবায়ী, সমন্বয়ী ও যৌগিক ভাষা। সর্বসমবায়ী ভাষাগুলির মধ্যে ফেলা হয়েছে আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি। যৌগিক ভাষাগুলিও দুরকম। যথা — উপসর্গ যৌগিক ও অনুসর্গ যৌগিক। উপসর্গ যৌগিক ভাষাগুলির মধ্যে বান্টুকে ফেলা হয় আর অনুসর্গ যৌগিক ভাষাগুচ্ছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তামিল ও তুর্কী ভাষা। আর সমন্বয়ী ভাষাগুচ্ছের মধ্যে পড়ে সংস্কৃত, আরবি, হিব্রু, গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি ভাষা।

৩০১.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহের ঐতিহাসিক বর্গীকরণ করো।

২। পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহের উৎস নির্ণয় করে উদাহরণসহ শ্রেণিবিভাগ করো।

৩। পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহের বিশ্লেষণ করো।

৩০১.১.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩) — ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬) — সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭) — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬) — রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮) — মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০) — পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮) — রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪) — অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১) — নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭) — ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮) — অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪) — আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

একক - ২

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.১.২.১ : বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.১.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.১.২.১ : বৈশিষ্ট্য

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলি বিশ্লেষণ করলে নানা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে —

১. ইন্দো-ইউরোপীয় রূপতত্ত্বের বিচারে শ্লিষ্ট যোগাত্মক ভাষা।

২. এই ভাষায় শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হত। সে কারণে এই ভাষাকে 'প্রাত্যয়িক' ভাষা বলা হয়। তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রত্যয়, সঙ্কেত চিহ্নের দ্বারা ব্যবহার করা হত।

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রত্যয় বহির্মুখী। যদিও আরবি-আদি-সেমিয় হামীয় গোষ্ঠীর ভাষায় প্রত্যয় অন্তর্মুখী।

৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যয় - বিভক্তির বৈচিত্র্য। এই ভাষাবংশ থেকে একাধিক ভাষা জন্ম নিয়েছে। এই ভাষাগুলি পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেছে এবং স্বাধীনভাবে প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত করে নিয়েছে। ফলে এই বংশের ভাষাগুলির মধ্যে প্রত্যয়-বিভক্তির বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

৫. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধাতুমূলগুলি একাক্ষরযুক্ত ছিল। ধাতুর সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদ গঠিত হত। এই পদই বাক্যে ব্যবহৃত হত।

৬. এই ভাষাবংশের ভাষাগুলিতে প্রত্যয়যুক্ত ধাতুকে শব্দ বলা হত। এই শব্দের সঙ্গে পুরুষবাচক বিভক্তি যুক্ত করে পদ গঠন করা হত।

৭. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সমাসবন্ধন। তবে সমাসবদ্ধ শব্দে বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত হয়েছিল। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারও দেখা যেত। যেমন—গ্রীকের উপশাখা ওয়েলস ভাষায় দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৮. ধাতুর দ্বিত্বসাধন বা ধাতুর শেষে প্রত্যয় যুক্ত করাও ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবে প্রত্যয়গুলি মূলত তিনটি ধ্বনি যোগে গঠিত হয়েছিল।

৯. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় শব্দের আগে উপসর্গ ব্যবহার করা হত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের জন্য উপসর্গ ব্যবহার করা হত। যেমন—গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় উপসর্গ যোগ করে শব্দের অর্থের পরিবর্তন করা হত। তবে শব্দের সঙ্গে উপসর্গ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত ছিল না।

১০. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল অপশ্রুতি বা স্বরক্রমের পরিবর্তন। অর্থাৎ গুণবৃদ্ধি সম্প্রসারণ। স্বরক্রমের এই পরিবর্তন অনেকক্ষেত্রে ঘটেছিল। যেমন —

ক. ভাষার প্রস্বর (accent) অপশ্রুতির মূলে ছিল। কিন্তু প্রত্যয় বিভক্তি লোপ পাওয়ার ফলে শুধু স্বরক্রমের পরিবর্তনের মধ্যেই প্রস্বরের বিলুপ্তি চিহ্ন থেকে গেছে।

খ. শব্দমধ্যে স্বরবর্ণের পরিবর্তন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ঘটেছে। যেমন—'যজ্' ধাতু থেকে 'যক্ষ' ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দেও এই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যেমন—buy, bought ইত্যাদি।

১১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় তিন প্রকার পুরুষ ছিল। যথা—উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষ।

১২. এই ভাষায় বিশেষ্যের কারক ছিল আটটি (সম্বন্ধ পদ ও সম্বন্ধ পদ যোগে)।

১৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় লিঙ্গ ছিল তিন প্রকার। তবে লিঙ্গভেদ মূলত সচেতন ও অচেতন ভেদে হত। তাছাড়া কোনও লিঙ্গভেদ ছিল না।

১৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় দুটি বাচ্য ছিল। যথা—(ক) আত্মনেপদ। (খ) পরস্মৈপদ। তবে দুটি বাচ্য থাকলেও পাঁচটি ভাব ছিল।

১৫. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ক্রিয়ার কাল চার প্রকার ছিল। তবে ক্রিয়ার কাল সময়বাচক ছিল না। কেবল রীতি নির্দেশক রূপেই কাল প্রচলিত ছিল।

এ ছাড়াও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলির আরও কতগুলি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যও আছে। যেমন—

১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় স্বরধ্বনির সানুনাসিকতা বজায় ছিল না।

২. ণ্, ম্ ইত্যাদি অর্ধব্যঞ্জন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় অন্য কোনও ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনুনাসিক ব্যঞ্জনের কাজ করেছিল।

৩. এই ভাষায় শব্দ গঠনের জন্য একাধিক ব্যঞ্জক একসঙ্গে যুক্ত হত। তবে মূলস্বর একাধিক থাকলেও, কখনোই তা যুক্ত হয়নি।

৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় পৃথক স্বরধ্বনির ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় ছিল। যেমন— 'Kmtom'

৫. বিভিন্ন প্রকার আদি প্রত্যয় যেমন— শাতৃ-শানচ্ এবং বিভিন্ন প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়াও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত হত।

৬. সর্বনামের ব্যবহারও এই ভাষায় ছিল। তবে বিশেষণ ও সর্বনামকে আলাদা ভাবে দেখা হয়নি। সর্বনামের মধ্যে বিশেষণকে যুক্ত করা হয়েছিল।

৭. অব্যয়ের পরিবর্তনও এই ভাষায় হয়েছিল। এ ছাড়া বিশেষ্যের ব্যবহারও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ছিল, এইরকম অনুমান করা হয়।

৮. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সুরের প্রয়োগ যেমন ছিল তেমনি ভাষা ছিল সঙ্গীতাত্মক।

৩০১.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষার পরিচয় দাও। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শ্রেণিবিভাগ করে উদাহরণসহ প্রত্যেক শ্রেণির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। মূল আর্যভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখে ওই ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনের পরিচয় দাও।

৩০১.১.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩) — ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬) — সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭) — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬) — রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮) — মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০) — পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮) — রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪) — অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১) — নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭) — ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮) — অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪) — আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

একক - ৩

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ (শ্রেণি বিভাগ, ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র, গুরুত্ব)

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.১.৩.১ : শ্রেণিবিভাগ
৩০১.১.৩.২ : ধ্বনিতালিকা (স্বর, অর্ধস্বর, অর্ধব্যঞ্জন, ব্যঞ্জন)
৩০১.১.৩.৩ : ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র
৩০১.১.৩.৪ : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের গুরুত্ব
৩০১.১.৩.৫ : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকে আর্য বলার কারণ
৩০১.১.৩.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৩০১.১.৩.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.১.৩.১ : শ্রেণিবিভাগ

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষ অর্থাৎ মূল আর্যজাতি ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সময় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে ১০টি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়। যেমন —

১. ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian)
২. আর্মেনীয় (Armenian)
৩. বালতো-স্লাভিক (Balto-Slavic)
৪. আলবানীয় (Albanian)
৫. গ্রীক (Greek)
৬. ইতালিক (Italic)
৭. কেলতিক (Celtic)
৮. জার্মানিক বা টিউটনিক (Germanic/Teutonic)
৯. তোখারীয় (Tokharian)
১০. হিত্তীয় (Hittio)

ইন্দো-ইরানীয় :

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা হল ইন্দো-ইরানীয় ভাষা। এই ভাষাবংশের একটি দল প্রথমে ইরানে ও পরে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে ইউরোপ থেকে আসে। এই ভাষার মধ্যেই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন কাঠামোটি পাওয়া যায়।

ইরানীয় ভাষা শাখার প্রাচীন স্তরটি (খ্রি: পূ: ৩০০) প্রাচীন ইরানীয় নামে পরিচিত। এই প্রাচীন ইরানীয় ভাষার আবার দুটি স্তর লক্ষ্যণীয়। যথা— আবেস্তান ও ফারসি। 'আবেস্তান' ফেরাসট্রিয়ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ। এটি ৬০০ খ্রি: পূর্বাব্দে রচিত প্রাচীনতম কবিতা। আবেস্তান ভাষার সঙ্গে ঋগ্বেদের ভাষার মিল আছে। আর প্রাচীন ফারসির নমুনা দেখা যায় দারিয়ুস ও খারেকসের অনুশাসনে। তবে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার দুটি স্তর আবেস্তান ও প্রাচীন ফরাসির সম্পর্ক আছে।

ইন্দো-ইরানীয় শাখার মধ্য স্তরটির (৩০০ খ্রি: পূ:—৯০০খ্রি:) পাহলভী বা মধ্য ফারসি ভাষাটি ইরানের পূর্বদিকে 'সোগদিয়ান' ও দক্ষিণে 'সাকা' কথ্যভাষারূপে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইরানীয় ভাষার বিভিন্ন শাখা ইরান ছাড়াও পার্শ্ববর্তী নানা অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন — পাকিস্তানের বালুচি ভাষা, আফগানিস্তানে ব্যবহৃত পশতু, ইরানে ব্যবহৃত ফারসী, ইরাকে ব্যবহৃত কুর্দিশ, উত্তর ককেশাসে ব্যবহৃত ওসেসিক ইত্যাদি ভাষা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাশাখার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আবার ইরানীয় ভাষার পরিবর্তে তুরস্কীয় ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে অনেক স্থানে। কারণ তুরস্কীয় ভাষা ইরানীয় ভাষার স্থান দখল করেছে।

ইন্দো-ইরানীয় ভাষার যে শাখাটি ভারতে প্রবেশ করে তাকে বলা হয় আর্যভাষা। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষীরা নিজেদের 'আর্য' হিসেবে পরিচয় দিত। সেই কারণে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাকে 'আর্যভাষা' মনে করা হত। এই ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনে আর্যশাখার প্রভাব আছে। যেমন —

১. ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় মূল ভাষার হ্রস্ব এবং দীর্ঘ (অ,এ,ও) পরিবর্তিত হয়েছে 'অ' এবং 'আ' তে।

২. এই ভাষার অতি হ্রস্ব (অ) - 'ই' কারে পরিণত হয়েছে।

৩. হ্রস্ব ও দীর্ঘ 'এ' কার এবং 'ঈ' কারের পরবর্তী কণ্ঠ ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্গের ধ্বনি 'চ' বর্গের ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে আর্যভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি ইন্দো-ইরানীয় শাখায় অনুসৃত। তাছাড়া বলা হয় আর্য শাখারই দুটি প্রধান শাখা— ইরানীয় আর্য ও ভারতীয় আর্য। ভারতীয় আর্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'ঋগ্বেদ সংহিতা' (খ্রি: পূ: ১২০০)। ভারতীয় আর্যভাষায় লেখা হয়েছিল বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। এই শাখার আধুনিক ভাষা বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, গুজরাটি, মারাঠী ইত্যাদি।

আর্মেনীয় :

এই ভাষার নমুনা পাওয়া যায় পঞ্চম শতকে। দক্ষিণ ককেশাস ও পশ্চিম তুরস্কের কিছু অঞ্চলে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। তবে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে (আনু খ্রি: পূ ৭ম-৮ম) আর্মেনীয় ভাষার প্রাচীন রূপটি পাওয়া যায়। আধুনিক আর্মেনীয় ভাষা আর্মেনীয়ার বাইরে অনেক দেশে প্রচলিত আছে। এ্যাকেডিয়ান ও গ্রীকদের নানা বিবরণী থেকে জানা যায় আর্মেনিয়ানী আর্মেনিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। ধর্মসংক্রান্ত নানা বর্ণনা আর্মেনিয়ানরা আর্মেনীয় ভাষায় রচনা করেন। এই ভাষা বর্তমানে লিখিত ভাষা হিসেবে প্রচলিত থাকলেও এবং ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন পরবর্তীকালে খুব কমই হয়েছে। তবে এই ভাষা উনিশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

আর্মেনীয় ভাষার দুটি স্তর লক্ষ করা যায়। যথা —

ক. পূর্বাঞ্চলীয় আর্মেনীয়।

খ. পশ্চিমীয় আর্মেনীয়।

পূর্বাঞ্চলীয় আর্মেনীয় ভাষা রাশিয়া ও ইরানে প্রচলিত ছিল। আর পশ্চিমীয় আর্মেনীয় তুরস্কে। আর্মেনীয় ভাষার একটি শাখা হল হিট্টীয়। এই শাখার কিছু কিছু প্রভাব বর্তমানেও লক্ষ করা যায়। হিট্টীয় শাখার ধ্বনিপরিবর্তনের কিছু রীতি লক্ষণীয়। যেমন —

ক. এই ভাষায় কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দের আদিতে ইন্দোহিট্টীয় কণ্ঠনালীয় ধ্বনির রেশ 'হ' কার রূপে থেকে গেছে। যেমন —

হব হিট্টীয় 'হুহহস' ল্যাটিন 'আবুস্' থেকে এসেছে।

বালতো-স্লাভিক :

গত এক হাজার বছর থেকে এই ভাষা প্রচলিত। বালতো-স্লাভিক শাখার দুটি উপশাখা হল —

ক. বাল্‌তিক

খ. স্লাভিক

বালতিক উপশাখার উল্লেখযোগ্য ভাষা লিথুয়ানীয়। এরপর বলতে হয় লাটবিয়ায় লেট ভাষার কথা। তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সকল আধুনিক ভাষার মধ্যে লিথুয়ানীয় সবচেয়ে প্রাচীন। লিথুয়ানীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়শ শতকে। লিথুয়ানীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য হল —

ক. সংস্কৃতের অপাদান ছাড়া অন্যান্য কারক এই ভাষায় রক্ষিত হয়েছে।

খ. স্বরাঘাত ও সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের ব্যবহার এই ভাষায় সংরক্ষণশীলতা এনেছে।

বাল্‌তিক উপশাখার আরেকটি ভাষা হল প্রাচীন প্রুশীয়। এই ভাষায় প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের দিকে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে প্রুশীয় ভাষা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ এই ভাষায় স্বরধ্বনিগুলি সব রক্ষিত ছিল।

আরেকটি সৃজ্যমান বাল্‌তিক ভাষা হচ্ছে ল্যাটাভিয়ান বা লেটিস। এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়শ শতক থেকে। এর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল —

১. এই ভাষায় স্বরাঘাত নেই।

২. বহুরূপমূলের সম্প্রসারিত প্রত্যয়ও এখানে সংযুক্ত হয় না।

তবে বালতিক শাখার লিথুয়ানীয় ও ল্যাটাভিয়ান উভয় ভাষারই অনেকগুলি উপভাষা আছে। বর্তমানে এই দুই প্রকার ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কয়েকলক্ষ মাত্র।

বালতো-স্লাভিক শাখার অপর একটি উপশাখা শ্লাভীয়। নবম শতকে এই শাখার নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্লাভীয় ভাষাভাষীরা একসময় বসবাস করত পোল্যান্ড ও পশ্চিম সেভিয়েত ইউনিয়নে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে রোমান সাম্রাজ্য বুলগেরিয়াতে এই ভাষা বিস্তারলাভ করেছিল। মূলত খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার চলে এই ভাষাতেই। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে খ্রিস্টান মিশনারী সাইরিল ও মেথোডিয়াস কর্তৃক শ্লাভীয় ভাষায় বাইবেল অনুদিত হয়। রাশিয়ার খ্রিস্টানরা বুলগেরীয় ভাষাকে সরকারি ভাষা রূপে গ্রহণ করেছে। রোমান সাম্রাজ্যে যেমন ল্যাটিন ভাষা ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি রোমানদের শ্লাভীয় ভাষা পূর্ব ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বর্তমানে শ্লাভীয় ভাষার তিনটি শাখা দেখা যায়। যেমন —

ক. দক্ষিণ শ্লাভীয় ভাষা।

খ. পশ্চিম শ্লাভীয় ভাষা।

গ. পূর্ব শ্লাভীয় ভাষা।

দক্ষিণ শ্লাভীয় ভাষার মধ্যে পড়ে বুলগেরীয়, সার্বো-ক্রোয়েশান, শ্লোভেনীয় ইত্যাদি ভাষা। পশ্চিম শ্লাভীয় ভাষার মধ্যে চেক, শ্লোভাক, পোলিশ, ওয়েন্ডিস ইত্যাদি ভাষা ভুক্ত হয়েছে। আর পূর্ব শ্লাভীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি হল গ্রেট রাশিয়ান, হোয়াইট রাশিয়ান ও ইউক্রেনিয়ান ইত্যাদি।

কালগত পার্থক্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বালতো ও শ্লাভীয় ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা কঠিন হয়েছে। কিন্তু অনেকে এই দুটি শাখাকে মিলিয়ে বালতো-স্লাভিক ভাষা বলে থাকেন। এই ভাষারই শ্রেষ্ঠ উপশাখা বুলগেরীয়। এই ভাষাতেই নবম শতকে বাইবেলের অনুবাদ করা হয়। বালতো-স্লাভিক শাখার একটি সাহিত্যসমৃদ্ধ ভাষা হল রুশ ভাষা। এটি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান ভাষা।

আলবানীয় :

অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে আলবানীয় শাখার আধুনিক ভাষাটি বর্তমানে প্রচলিত আছে। এই ভাষার প্রাচীনতম শাখা সপ্তদশ শতকেও প্রচলিত ছিল।

আলবানীয় ভাষার দুটি উপভাষা আছে। একটি উত্তরাঞ্চলে 'গেগ' নামে প্রচলিত। অন্যটি দক্ষিণের 'তোস্ক' নামে প্রচলিত। তোস্ক উপভাষাটি গ্রিস ও ইতালিতেও প্রসারিত। তবে আলবানীয় ভাষার আদি অবস্থান নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। উত্তর আলবানীয় প্রাচীনকালে ইলিরিয়ের অংশ ছিল। পরবর্তীকালে শ্লাভদের দ্বারা আলবানীয় শাখাটি সমৃদ্ধ হয়। সাধারণভাবে বলা হয় বলকান অঞ্চলে আলবানীয় ভাষাভাষী মানুষরা বসবাস করে। ফলে আলবানীয় ভাষা বলকান অঞ্চলেই প্রসারিত ছিল। এ ছাড়াও গ্রিসের রাজধানী এথেন্স, দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলিতেও আলবানীয় ভাষা ব্যবহার হতে থাকে। পঞ্চদশ শতকেও প্রাচীন আলবানীয় ভাষার নিদর্শন মেলে। তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এই আলবানীয় শাখাটি সবচেয়ে বেশি বিকৃত হয়েছে বলা হয়। এই শাখার প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় ল্যাটিন, গ্রীক, স্লাভিক, ইতালি, তুর্কি প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রীক :

খ্রি: পূ: দু-হাজার বছর আগে অনার্য জাতি গ্রিস সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের গ্রীক শাখাটি গ্রিস, এশিয়া মাইনর, সাইপ্রাস দ্বীপ, ইজিয়ান উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাচীন গ্রীক ভাষা দুভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) পশ্চিমাঞ্চলীয়, (খ) পূর্বাঞ্চলীয়।

পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রীক আবার দু-ভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) উত্তর-পশ্চিম (খ) ডোরিক।

পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীক ভাষাটি হল আটিকা। এশিয়া মাইনরে ব্যবহৃত আটিক আয়োনিক ভাষাটি। আর দ্বিতীয় উপশাখা অর্থাৎ ডোরিক ভাষাটি হল বেওটিয়া ও থিসালির আয়োনিক ভাষা। যাই হোক, ড্রেনট্রিস ও জন চ্যাডউইকের দ্বারা জানা গেছে খ্রি: পূ: চতুর্দশ শতকে গ্রীক ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাছাড়া হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'-তে গ্রীকের প্রাচীনতম রূপটির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীক ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অনুমান করা হয় ক্রীট দ্বীপের একটি প্রত্নলেখে গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে।

গ্রীক ভাষার অনেকগুলি উপভাষা আছে। যেমন—

১. আত্তিক ইত্তনিক।

২. দোরিক।

৩. আর্কাদিয়ান-সাইপ্রিয়াণ।

৪. আয়োলিক।

৫. উত্তর-পশ্চিমা গ্রীক প্রভৃতি।

গ্রীক ভাষায় আরও দুটি উপভাষার নাম উল্লেখ করতে হয়। নাম সাইপ্রাস ও পোলোপানিসে। তবে আত্তিক-ইওনিক উপভাষাটি গ্রীক ভাষার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। আবার গ্রীক ভাষার বিভিন্ন উপভাষার মিশ্রণে সাধু গ্রীক ভাষার উদ্ভব হয়েছে। যার নাম কোইনে। গ্রিসে 'কোইনে' উপভাষাটি কথ্য ভাষার পরিণত হয়েছে।

ইতালিক :

গ্রীক ভাষার পরেই উল্লেখ করতে হয় ইতালিক ভাষা। বহিরাগতরা যেমন গ্রিসে গ্রীক ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, তেমনিভাবেই ইতালিতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ইতালিক ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। ইতালিক ভাষার প্রধান শাখা হল লাতিন। লাতিন ভাষা কেন্তুম্‌গুচ্ছের মধ্যে পড়ে। ইতালির লাতিউম প্রদেশে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। আবার রোমেও পরবর্তীতে লাতিন ভাষা প্রধান হয়ে ওঠে। রোমের বাইরেও এই ভাষা বিস্তৃত হয়। তবে ইতালিক ভাষার এই প্রধান শাখাটির নিদর্শন খ্রি: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীতেই পাওয়া যায়।

লাতিন ছাড়াও ইতালিক ভাষার আরও দুটি শাখা পাওয়া যায়। যথা—১. আসকান, ২. আমব্রিয়ান।

আর লাতিনকে বলা হত ল্যাটিন ফালিসফন। তবে লাতিন ভাষার প্রসারিত হওয়ায় আসকান ও আমব্রিয়ান ভাষাটি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল বলা যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম দুই শতাব্দীতে আসকান ভাষার প্রত্নলিপি পাওয়া যায়। আর আমব্রিয়ানের নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায়নি। গ্রীক ভাষার মতো ধ্বনিপরিবর্তনের রীতি আসকান ও আমব্রিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

১. গ্রীক ভাষায় কণ্ঠৌষ্ঠ্য 'ক' বর্গ 'প' বর্গে পরিণত হয়। আসকান-আমব্রিয়ান ভাষাতেও তাই হয়।

কিন্তু লাতিনে একটু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন—'Qwist' শব্দটি আসকানে হয়েছে 'পিস', আমব্রিয়ানে 'পিসি'। কিন্তু লাতিনে হয়েছে 'কিস'।

ইতালিক ভাষার প্রধান শাখাটি হল লাতিন। এই ভাষা থেকেই পরবর্তীতে রোমান্‌স ভাষাগুলির উদ্ভব হয়েছে। যেমন—ইতালির ইতালিক ভাষা, স্পেনের স্পেনীয় ভাষা, পোর্তুগালের পোর্তুগিজ ভাষা, ফ্রান্সের ফরাসি ভাষা, সুইজারল্যান্ডের রেটোরোমেক ভাষা ইত্যাদি।

খ্রি:পূ: দ্বিতীয় শতকে আসকান ও প্রথম শতকে আমব্রিয়ানের কিছু লিপিমূলক নিদর্শন পাওয়া গেলেও ফলসিকান সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রাচীনকালে পাওয়া যায়নি। এগুলি ছাড়াও ইতালিক শাখার আরও একটি উপশাখা পাওয়া যায়। যার নাম ভেনেটিক। উত্তর-পূর্ব ইতালিতে এই শাখাটির ভাষা এক সময় প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র অনুশাসনেই এই ভাষাটিকে জীবিত থাকতে দেখা যায়। লাতিন শাখাটি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। যেমন—১. চলতি লাতিন, ২. ধ্রুপদী লাতিন।

রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্রই চলতি লাতিন ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু, ধ্রুপদী লাতিন লিখিত ভাষারূপে স্বীকৃত ছিল অনেক আগে থেকেই।

কেলতিক :

ইতালিক ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কেলতিক ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়। মূলত ইউরোপে একসময় কেলতিক ভাষার বহুল ব্যবহার ছিল। সেন্টরা এই ভাষা ব্যবহার করত। ইউরোপেই

এই ভাষার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু অনেকেই ইউরোপ ছেড়ে পরবর্তীকালে স্পেন, উত্তর ইতালি ও এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এদের পরবর্তী বংশধররা ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডেও বসতি স্থাপন করে। ফলে কেলতিক ভাষার প্রাধান্য ক্রমশ কমে আসে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলিপিই কেলতিক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

কেলতিক ভাষাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—ক. ব্রাইথনিক খ. গয়ডলিক।

ব্রাইথনিক ভাষায় আবার অনেকগুলি উপভাষা আছে। যেমন—গলিস, ওয়েলস, কর্নিশ, ব্রেটন প্রভৃতি। গলিস ছাড়া ব্রাইথনিক ভাষার সবকটি উপভাষাই ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। গলিস বিলুপ্ত ভাষায় পরিণত হয়েছে অনেক আগে। কেলতিক ভাষার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপভাষা বলা যায় 'ওয়েলস' ভাষাটিকে। অষ্টম শতকে এই ভাষাটির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই একই সময়ে ব্রেটন উপভাষাটিরও নিদর্শন মেলে। ব্রেটন এখনও ব্রিটেনে প্রচলিত আছে। কিন্তু ব্রাইথনিক শাখার কর্নিশ উপভাষাটি বিলুপ্ত হয়েছে অষ্টাদশ শতক থেকেই।

কেলতিক ভাষার গয়ডলিক শাখাটিরও দুটি উপভাষা আছে। যেমন—ক. আইরিশ খ. ম্যাংস।

আইরিশ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলিপিতে। এ ছাড়া অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত কিছু গ্রন্থেও আইরিশ ভাষার নিদর্শন মেলে। স্কটল্যান্ডে আইরিশ ভাষাটির আগমন ঘটেছিল পঞ্চম শতকেই, তবে নাম পরিবর্তিত হয়ে। ভাষাটি 'স্কটস গেলিক' নামে স্কটল্যান্ডে পরিচিত হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে আইরিশ ভাষাটি এখনও জীবিত। 'ম্যাংস' ভাষাটি একসময় আইল অব ম্যান অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে এটি একেবারে লুপ্ত।

অনেক ইতালিক ও কেলতিক ভাষাকে একটি জোড় বলে মনে করেন। কারণ ইতালিক ও কেলতিক দুটি শাখার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অনুমান করা হয়, মূল ভাষা থেকে আলাদা আলাদা ভাবে না বের হয়ে কেলতিক ও ইতালিক ভাষাটি একই সঙ্গে জন্ম নেয় এবং পরবর্তীতে দুটি শাখায় পরিণত হয়। যে কারণে কোনও কোনও ভাষাতাত্ত্বিক এই দুটি শাখাকে আলাদা করে না দেখে 'ইতালো-কেলতিক' শাখা নামে একটি ভাষায় পরিণত করে দেখিয়েছেন। আসলে কেলতিক ভাষাটি ইউরোপে ব্যাপক প্রসারলাভ করলেও ইতালিক ও টিউটনিক ভাষার প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। বর্তমানে কেলতিক শাখার প্রধান আধুনিক ভাষাটি হল আয়ারল্যান্ডে ব্যবহৃত 'আইরিশ ভাষা'। যেটি বর্তমানেও একইভাবে আয়ারল্যান্ডে প্রচলিত। আর সবগুলিই বিলুপ্তপ্রায় ভাষায় পরিণত হয়েছে।

জার্মানিক বা টিউটনিক :

রোমানরা জার্মান ও কেলতিক ভাষা সম্পর্কে ইতিবাচক মত পোষণ করেন না। কারণ জার্মান ভাষার রূপমূলটি কেলতিক ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন জার্মান ভাষার নিদর্শন চতুর্থ শতকের আগে পাওয়া যায়নি। পূর্ব জার্মানিক শাখায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'বুল্‌ফিলা' বাইবেলের অংশবিশেষের অনুবাদটিই হল জার্মানিক শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন। তবে পূর্ব শাখায় আধুনিক ভাষা নেই। আর পশ্চিম শাখা নামে একটি শাখারও অস্তিত্ব জার্মানিক ভাষায় পাওয়া যায়। জার্মানিক শাখা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল।

যেমন— ১. পূর্ব জার্মান ভাষা। ২. উত্তর জার্মান ভাষা। ৩. পশ্চিম জার্মান ভাষা।

পূর্ব জার্মানিক ভাষার কোনও আধুনিক শাখা নেই। কিন্তু উত্তর জার্মানিক ভাষার আধুনিক শাখাটি হল সুইডেনের ভাষা 'সুইডিশ্' ও আইসল্যান্ডের ভাষা 'আইসল্যান্ডিক'। স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের সম্প্রসারণের সময় জার্মানিক ভাষা আবার দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা—

১. সুইডিস, ভেনিস ও গাটনিস সংযোগে গঠিত পূর্বনস।

২. নরওয়েজিয়ান ফ্যারোইস ও আইসল্যান্ডীয় সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিম নর্স।

এ ছাড়াও জার্মানিক ভাষার পাঁচটি শাখা লক্ষ করা যায়। যথা—

১. হাই জার্মান, ২. ফ্যাংকোনিয়ান, ৩. লো জার্মান, ৪. ফ্রিশিয়ান ৫. ইংরেজি।

তবে মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে জার্মান ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ইদ্দিস' নামে স্বতন্ত্র একটি উপভাষার জন্ম হয়েছে।

হাই জার্মান ভাষাটি আট শতকের পূর্বে উত্তরাঞ্চলের জার্মানীয় উপভাষায় প্রভাব ফেলেছিল। আর দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত ছিল স্যাকসন ভাষাটি। এই ভাষাটিই লো জার্মান ভাষার রূপ গ্রহণ করেছিল পরবর্তীকালে। ত্রয়োদশ শতক থেকে নেদারল্যান্ডের সমুদ্রবর্তী অঞ্চল, দ্বীপে ও পশ্চিম জার্মানিতে ফ্রিশিয়ান উপভাষাটি ব্যবহৃত হয়। আর ইংরেজি ভাষাটি জার্মান থেকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয় সপ্তম শতকে। প্রাচীন ইংরেজির নিদর্শন হিসেবে ধরা হয় 'কায়ভমনের স্তোত্র' ও 'বিউলফে'। এগুলি সাতশো পঞ্চান্ন খ্রি: আগের রচনা বলে একে অনুমান করা হয়। প্রাচীন ইংরেজির আবার তিনটি উপভাষা ছিল। যথা—

১. কেলতিক, ২. স্যাকসন ৩. এ্যাংলিয়ান।

উল্লেখ্য এ্যাংলিয়ানও দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল। যথা—হামব্রিয়ান ও মার্সিয়ান। ষোড়শ শতক থেকে ইংরেজি বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মূলত পশ্চিম জার্মানিক শাখাটি থেকেই আধুনিক ইংরেজি জার্মান ও ওলন্দাজ ভাষার জন্ম হয়েছে। জার্মান ভাষাটি বিশেষ ধ্বনিপরিবর্তনের কারণে ইংরেজি ও ওলন্দাজ ভাষা থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, জার্মানিক শাখায় ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনগুলি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গ্রীম এই পরিবর্তনের সূত্রগুলি প্রথম দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে গ্রাসম্যান, ভার্নার প্রমুখ এই ভাষার অনেক সূত্র দিয়েছেন। **গ্রীমের সূত্রে বলা হয়েছে**—

মূল ভাষার বর্গের চতুর্থ, তৃতীয় এবং প্রথম ধ্বনি জার্মানিক শাখায় যথাক্রমে বর্গের তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রাসম্যানের মতে, বিষমীভবন জার্মানিক ভাষায় দেখা যাচ্ছে। আসলে জার্মানিক ভাষায় মূলভাষার কোনও পদে পাশাপাশি দুই অক্ষরে মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকলে, তাদের মধ্যে একটি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

ভার্নারের মতে, মূল ভাষার পদটি একাক্ষর না হলে ব্যঞ্জনধ্বনির আগের অক্ষরে স্বর না থাকলে বর্ণের প্রথম ধ্বনি ও 'স' জার্মানিক শাখায় যথাক্রমে বর্গের তৃতীয় ধ্বনি 'জ'-তে পরিণত হবে।

এই ধ্বনিপরিবর্তনগুলির জন্যই জার্মানিক ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাছাড়া পশ্চিম জার্মানিক শাখাটির আধুনিক একটি ভাষা হল ইংরেজি, যা বর্তমানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও মুখ্য ভাষা।

তোখারীয় :

উনিশ শতকে তোখারীয় শাখার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। চিনের অন্তর্গত তুর্কিস্থানে এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে কতগুলি পুঁথি ও প্রত্নলেখের সন্ধান মেলে। অনূদিত এগুলি খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। এই প্রত্নলেখগুলি থেকে জানা যায় তুখার বা তুষার জাতির ভাষা ছিল তোখারীয়। চীনা তুর্কীয় বৌদ্ধদের রচনায় তুখারীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন আছে। আর গ্রন্থের রচনাকাল অনুমান করা হয় অষ্টম শতক।

তোখারীয় ভাষাটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—

১. পূর্ব অঞ্চলের ভাষা ২. পশ্চিম তোখারীয়।

পূর্ব অঞ্চলের তোখারীয় শাখাটি 'তোখ্‌রী' নামে পরিচিত। আর পশ্চিম তোখারীয় ভাষাটি 'কুচিয়ান' নামে।

তোখারীয় ভাষাটি যদিও এশিয়ায় অবস্থিত, কিন্তু বালতো-স্লাভিক, আর্মেনীয় ও ইন্দো-ইরানীয় শাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তবে কেলতিক ও ইতালিক শাখার সঙ্গে এই ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তোখারীয় ভাষার একটি বিশেষ ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি লক্ষ করা যায়। সেটি হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় শিস্‌ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে ধ্বনিগুলি, সেগুলি তোখারীয় ভাষার অন্য ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত। যেমন—তোখারীয় ভাষায় 'ক' ধ্বনিটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনির পূর্বে সংরক্ষিত হয়েছে।

যাই হোক তোখারীয় ভাষাটি বর্তমানে লুপ্ত। পণ্ডিতদের অনুমান সপ্তম শতকের পর থেকেই এই ভাষাটি লুপ্ত হতে শুরু করে। বর্তমানে তোখারীয় ভাষা থেকে সৃষ্ট কোনও আধুনিক ভাষার পরিচয় মেলে না।

হিত্তীয় :

তোখারীয় ভাষার মতোই হিত্তীয় ভাষাটি সম্প্রতিই আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনটি এশিয়া মাইনরের কাপাদোকিয়া প্রদেশের বাণমুখ লিপিতে পাওয়া যায়। খ্রি: পূ: বিংশ শতক থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে এগুলি লিখিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। অনেকে আবার মনে করেন হিত্তীয় ভাষাটি মূল আর্য ভাষার সমসাময়িক কালের স্বতন্ত্র একটি ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে ১৯১৫ সালে বি. হ্রোজনী হিত্তীয় ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয়ের বংশধর বলে সনাক্ত করেন। ভাষাতাত্ত্বিক জে. কুরিলোয়িজ হিত্তীয় ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন বিচার করে প্রমাণ করেছেন, সসিউর ১৮৭৯ সালে যে ধ্বনির প্রস্তাব করেন, তার সঙ্গে হিত্তীয় ভাষার ধ্বনির পরিবর্তনগুলি যথেষ্টই মেলে। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক হিত্তীয় ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কন্যাভাষা বলেই মেনে নিয়েছেন।

হিত্তীয় ভাষা থেকে আরও দুটি সম্পর্কিত ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা দুটি হল—

১. লুইয়িআন

২. প্যালাইক

লুইয়িআন ও প্যালাইক ভাষা ছাড়াও লিসিয়ান ও লিডিয়ানের সঙ্গেও হিত্তীয় ভাষার মিল পাওয়া গেছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের একটি রীতি হিত্তীয় ভাষায়ও দেখা গেছে। যেমন— হিত্তীয় ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কণ্ঠ্যধ্বনি সংরক্ষিত। তবে হিত্তীয় ভাষার ব্যাকরণ ইন্দো-ইরানীয় ও গ্রীক ভাষার তুলনায় অনেক সরল। মনে রাখা দরকার হিত্তীয় ভাষাটির নিদর্শনই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাটির অস্তিত্ব যে ৩০০০ খ্রি: পূর্বে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

নিম্নে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে সৃষ্ট ভাষাগুলির বর্গীকরণ করা হল:

৩০১.১.৩.২ : ধ্বনিতালিকা (স্বর, অর্ধস্বর, অর্ধব্যঞ্জন, ব্যঞ্জন) :

স্বরধ্বনি :

হ্রস্ব : অ/*a*/, এ/e/, ও/o/, ই/i/, উ/u/

দীর্ঘ : আ/ā/, এ//, ও//, ঈ/i/, ঊ//

অতিহ্রস্ব : অ/১/

মোট ১১টি স্বরধ্বনি।

অর্ধস্বর : য়/y/, অন্তঃস্থব (ব)/w/

মোট ২টি অর্ধস্বর।

অর্ধব্যঞ্জন :

হ্রস্ব : ঋ/r/, ৯//

দীর্ঘ : ৠ//, ৯৯//

হ্রস্ব : ন/n/, ম/m/

দীর্ঘ : ন//, ম//

মোট ৮টি অর্ধব্যঞ্জন।

ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা :

স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন :

পুরঃ কণ্ঠ্য : ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্

কণ্ঠ্য বা পশ্চাৎ কণ্ঠ্য : ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্।
(q, qh, g, gh, n)

কণ্ঠৌষ্ঠ্য : ক্ব, খ্ব, গ্ব, ঘ্ব, ঙ্ব
(qw, qwh, gw, gwh, nw)

দন্ত্য ও দন্তমূলীয় : ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্
(t, th, d, dh, n)

ঔষ্ঠ্য : প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্,
(p, ph, b, bh, m)

কম্পিত ব্যঞ্জন : র/r/

পার্শ্বিক ব্যঞ্জন : ল/l/

উষ্ম ব্যঞ্জন : পুর: কণ্ঠ্য, পশ্চাৎ কণ্ঠ্য, কণ্ঠৌষ্ঠ্য : [ক., (খ্.), গ. (ঘ.), (x, 'y']

দন্ত্য ও দন্তমূলীয়—স্(য্) [জ, ত,(থ), দ(ধ), (২, θδ]

৩০১.১.৩.৩ : ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র :

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ধ্বনি তালিকাটি পুনরায় গঠিত হয়েছে। মূলত অনুমানের উপর নির্ভর করে বর্তমান ভাষা থেকে অতীত ভাষার উৎস সন্ধান করা হয়েছে। ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উৎস ভাষার কোন্ কোন্ ধ্বনি পরবর্তী ভাষায় কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ভাষাবিজ্ঞানীরা কয়েকটি ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। যথা—

ক. গ্রীমের সূত্র।

খ. গ্রাসম্যানের সূত্র।

গ. ফেরনেরের সূত্র বা ভার্নারের সূত্র।

ঘ. কোলিৎজ-র সূত্র

গ্রীমের সূত্র :

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উৎস ভাষার ধ্বনি জার্মানিক শাখার ভাষায় কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তা গ্রীমের সূত্রে আলোচিত হয়েছে। সূত্রটি তিনটি অংশে বিভক্ত। ইয়াকব গ্রীম 'ডয়ট্স-শে গ্রামাটিক' বইটিতে সূত্রগুলি লিখেছেন। সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

১. বর্গের চতুর্থ ধ্বনিগুলি (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি। কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি মহাপ্রাণতা হারিয়ে তৃতীয় ধ্বনি হবে। উদাহরণ—

ঘ, ধ, ভ > গ, দ, ব

২. অনুরূপভাবে তৃতীয় ধ্বনির রূপান্তর হয়েছে এইভাবে গ, দ, ব > ক, ত, প। অর্থাৎ জার্মানিক ভাষায় অঘোষ ধ্বনি রূপান্তরিত হয়েছে অঘোষে।

৩. প্রথম ধ্বনি ক, ত, প > খ, থ, ফ হলে অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ উষ্ম ধ্বনিতে পরিণত হয়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গ্রীমের সূত্র অনুসারে ধ্বনির ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় আসছে। যথা—

ক. মহাপ্রাণ হীনতা।

খ. অঘোষীভবন।

গ. উষ্মীভবন।

মনে রাখতে হবে গ্রীমের সূত্রই ছিল ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম পদক্ষেপ।

গ্রাসম্যানের সূত্র :

গ্রীমের সূত্র সব শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। তাই গ্রাসম্যান কিছু নতুন সূত্র উদ্ভাবন করেন। এখানে দেখা যায়—১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোনো শব্দের পাশাপাশি দুই অক্ষরে মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকলে তার একটি ধ্বনি গ্রীক এবং ইন্দো-ইরানীয় শাখায় অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—ইন্দো-ইউরোপীয় একটি শব্দ হল—'Bhendhe'। এটি থেকে সংস্কৃতে 'বনধ্' এবং গ্রীকে 'পেনত' শব্দটি এসেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে 'ভ' ও 'ধ' দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি। এর মধ্যে

প্রথমটি হল 'ভ'। আর এই 'ভ' সংস্কৃতে 'ব' এবং গ্রীকে তা 'প' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ পাশাপাশি দুই অক্ষরের মহাপ্রাণ ধ্বনির একটি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রীমের সূত্র অনুসারে জানা যায় মূল আর্যভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মহাপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শধ্বনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জার্মানিক শাখায় পরিবর্তিত হলেও অন্যান্য শাখা, যেমন—সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি ভাষায় অপরিবর্তিত থাকার কথা। কিন্তু গথিকে যেখানে 'ব' থাকে, সেখানে সংস্কৃতে 'ভ' হতেও পারে। আবার গথিকে যেখানে 'ব' থাকে, সংস্কৃতে যেখানে 'ব' ই হয়েছে এমন উদাহরণও পাওয়া যায়। গ্রীম বলেছেন, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 'ব' এর স্থানে 'ভ' ছিল। তাহলে জার্মানিক শাখায় 'ভ' পরিবর্তিত হলেও সংস্কৃত বা অন্যান্য শাখায় কোনও পরিবর্তন হবে না। সেক্ষেত্রে 'ভ'ই হবে। কিন্তু সংস্কৃতে 'ভোধতি' শব্দটির পরিবর্তে 'বোধতি' শব্দটি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ 'ভ' এর পরিবর্তে 'ব'। এক্ষেত্রে গ্রীমের সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটছে। এই ব্যতিক্রমকেই দেখিয়েছেন গ্রাসম্যান।

ভার্নারের সূত্র :

গ্রীমের সূত্রে আরও একটি ব্যতিক্রম বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সেই ব্যতিক্রমটি ব্যাখ্যা করেছেন কার্ল ভার্নার। এই সূত্রটি ভার্নারের সূত্র নামেই পরিচিত। গ্রীমের সূত্রে বলা হয়েছে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক শাখায় মহাপ্রাণ অঘোষ উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হওয়ার কথা। কিন্তু গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় এই পরিবর্তন হবে না। সেই অনুসারে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় 'septm' থেকে সংস্কৃতে হয়েছে 'সপ্ত', গ্রীকে হয়েছে 'hepta', লাতিনে 'septem'। কিন্তু জার্মানিক ভাষা গথিকে 'sifum' হবার কথা থাকলেও 'sibum' হয়েছে। অর্থাৎ গ্রীমের সূত্রেরও ব্যতিক্রম আছে। গ্রাসম্যানের সূত্রেও কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেটি অবশ্য এখানে প্রযোজ্য নয়। ফলে দেখা যাচ্ছে গ্রীম ও গ্রাসম্যানের সূত্র সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না। বিশেষত গ্রীমের সূত্র সব শব্দে খাটে না। এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই ব্যতিক্রমকেই ভার্নার ব্যাখ্যা করেছেন। ভার্নারের সূত্রে বলা হয়েছে—

১. প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দটি যদি একটি অক্ষরের না হয় এবং ব্যঞ্জনধ্বনির আগের অক্ষরে যদি স্বরধ্বনি না থাকে, তাহলে বর্গের প্রথম ধ্বনি বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হবে। যেমন—ক, ত, প এবং স জার্মান ভাষাগুলিতে হয়েছে গ, দ, ব।

২. স (s) জার্মান শাখার ভাষাগুলিতে জ (z) হয়ে যাবে।

৩. প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহৃত 'ত' আধুনিক ও প্রাচীন ইংরেজি ভাষায় আলাদা আলাদা রূপে ব্যবহৃত হবে। যেমন—

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'Klutos' (ক্লুতোস) প্রাচীন ইংরেজিতে হয়েছে 'Hlud' এবং আধুনিক ইংরেজিতে হয়েছে 'loud'। এখানে ত (t) হয়েছে দ(d)-তে।

কোলিৎজর সূত্র :

গ্রীমের সূত্র, গ্রাসম্যানের সূত্র ও ভার্নারের সূত্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি জার্মানিক ভাষায় কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু কলিৎজর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন—

১. প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোনও শব্দে দীর্ঘ 'ঈ' ধ্বনির পরে কণ্ঠ্য বা কণ্ঠৌষ্ঠ ধ্বনি থাকলে তা সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যে 'চ' বর্গের ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন— জ্বীবোস > সংস্কৃতে জীবস এবং প্রাচীন পারসিক ভাষায় জীব।

প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই চারটি সূত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩০১.১.৩.৪ : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের গুরুত্ব

পৃথিবীতে যে সমস্ত ভাষাবংশ আছে, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল ইন্দো-ইউরোপীয়। বিখ্যাত বিখ্যাত আধুনিক ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাষাবংশের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন—

১. আনুমানিক ২৫০০ খ্রি: পূর্বাব্দে দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জন্ম। কিন্তু বর্তমানে এই ভাষার ব্যপ্তি সারা পৃথিবীতে। এই ভাষাবংশের ভাষাগুলি একসময় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিল। যেমন—প্রাচীন ভারতে বৈদিক ভাষা গ্রিসে গ্রীক ভাষা, পশ্চিম তুরস্কে আর্মেনীয় ভাষা, ইউরোপে কেলতিক, চিনের তুর্কিস্থানে তোখারীয়, জার্মানিতে জার্মানিক প্রভৃতি ভাষা।

২. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন ভাষাগুলির সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অভাবনীয়। যেমন—গ্রীক ভাষাটির একটি উপভাষা হল ইত্তলিক। এই ভাষাতেই হোমারের 'ইলিয়ড-ওডিসি' রচিত হয়েছে। এই বংশের ভাষা বৈদিকে লেখা হয়েছিল বেদ-উপনিষদ, সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'।

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ও উন্নত। যেমন— ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিস, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি।

৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলির সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি বিস্ময়কর।

৫. রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলি পৃথিবীতে বিশিষ্ট ভাষা।

৬. পৃথিবীর প্রাচীনতম নিদর্শন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষা থেকেই জাত। এইরকম অনুমান করা হয়। যেমন—বৈদিক ভাষার ঋগ্বেদ সংহিতা।

৭. এই ভাষাবংশের মানুষেরা বর্তমানে সংখ্যায় বেশি। যেমন—ইংরেজি, হিন্দি, জার্মান, ফরাসি, বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যাই বেশি। এই বংশের আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রভাষা।

৩০১.১.৩.৫ : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকে আর্য বলার কারণ

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। 'ইন্দো' শব্দটিতে 'India' বোঝায়। আর ইউরোপীয় বলতে সমগ্র ইউরোপকে বোঝায়। অর্থাৎ India দেশ আর ইউরোপ হল মহাদেশ। সুতরাং ইন্দো-ইউরোপীয় এই নামটি ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়।

আবার 'ইন্দো' বলতে শুধুমাত্র India বা ভারতকেই বোঝায় না। কারণ শুধুমাত্র ভারতেই ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলি ছড়িয়ে নেই। ভারতের বাইরে ইরানেও এই ভাষা প্রচলিত আছে। সেই কারণে এই ভাষাবংশের নামকরণ করা হয়ে থাকে 'ইউরো এশীয়'। কিন্তু এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সমগ্র ইউরোপে এই ভাষা প্রচলিত নেই। তবে সমগ্র জার্মানিতে এই ভাষা প্রচলিত আছে। তাই এই ভাষাকে 'ইন্দো-জার্মানিক' ভাষাও বলা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী শ্র্যাডার এই নাম দিয়েছেন।

কিন্তু 'ইন্দো-ইউরোপীয়' বা 'ইউরো এশীয়' নামটি যেমন সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়নি, তেমনি 'ইন্দো-জার্মানিক' কথাটিও নয়। কারণ এখানেও দেখা যাচ্ছে ভারত একটি দেশ কিন্তু জার্মানিও একটি দেশ। তাই এই ভাষাটিকে 'বৈদিক - জার্মানিক' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নামটিও গ্রহণীয় হয়নি। সুকুমার সেনের মতে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলি ভারত, ইউরোপ ও তার মধ্যবর্তী স্থানে প্রচলিত। কিন্তু এই সব স্থানের লোকেরা নিজেদের 'আর্য' বলে পরিচয় দেন। সুতরাং তাদের মুখে ব্যবহৃত হওয়ায় এই ভাষাটিকেও 'আর্যা' ভাষা বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী ম্যাক্সমুলারের মতে আর্য বিজ্ঞানসম্মত ভাষা। কোনও নির্দিষ্ট জাতির ভাষা নয় এটি। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ভাষা ছড়িয়ে আছে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে ইন্দো-ইউরোপীয়কে আর্য বলাই ঠিক হবে।

৩০১.১.৩.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বলতে কী বোঝো? এই ভাষাবংশের বৈশিষ্ট্য লিখে গুরুত্ব বিচার করো।

৩০১.১.৩.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩) — ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।
২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬) — সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭) — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।
৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬) — রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।
৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮) — মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।
৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।
৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।
৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০) — পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।
৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮) — রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।
১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪) — অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।
১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১) — নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।
১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭) — ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।
১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮) — অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।
১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪) — আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

একক - ৪

ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাজন, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা (বৈশিষ্ট্য ও রূপান্তর)

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.১.৪.১ : ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাগ

৩০১.১.৪.২ : প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

৩০১.১.৪.২.১ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.২.২ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.২.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৩ : মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

৩০১.১.৪.৩.১ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৩.২ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৩.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৪ : নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

৩০১.১.৪.৪.১ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৪.২ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৪.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৫ : সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা

৩০১.১.৪.৫.১ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৫.২ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৫.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

৩০১.১.৪.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.১.৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.১.৪.১ : ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাগ

পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশ। এই ভাষাবংশেরই অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলিই পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত। ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষা, ভারত ও ইরানের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষাগোষ্ঠীরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শাখা হল আর্যভাষা। এই আর্যভাষা থেকেই ইরান ও ভারতের প্রধান ভাষাগুলির উৎপত্তি ঘটেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর দুটি শাখা হল কেন্তুম ও সতম্। কেন্তুম গোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি হল গ্রীক, লাতিন, কেল্‌টিক, জার্মানিক ইত্যাদি। আর সতম্ গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে হল আলবানীয়, বাল্‌তো-স্লাবিক ও ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যভাষা। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার যে শাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাকে ভারতীয় আর্যভাষা বলা হয়। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি এই ভাষার যে বিবর্তন ঘটেছে, তাকে প্রধান তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা —

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (খিঃ পূঃ ১৫০০ - খ্রিঃ পূঃ ৬০০)

(খ) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (খ্রিঃ পূঃ ৬০০ - খ্রিঃ পূঃ ৯০০)

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (খ্রিঃ ৯০০ থেকে বর্তমান কাল)

৩০১.১.৪.২ : প্রাচীন ভারতের আর্যভাষা

এই আর্যভাষার দুটি স্তর। প্রথম বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূত্রগুলিতে। অনেকে মনে করেন এই সূত্রগুলি খ্রিস্টের জন্মের দুই-আড়াই হাজার বছর আগেকার লেখা। তবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনত্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে তুরস্কের কাপ্‌পাদোকিয়া প্রদেশের বোগাজকোই অঞ্চলে বহু প্রত্নলেখ অবস্থিত হয়েছে, যেগুলি সুপ্রাচীন কিউনিফর্ম ও হিয়েরোগ্লিফ বা চিত্র লিপিতে লিখিত ছিল। এগুলির অধিকাংশের ভাষা ছিল হিট্টীয়। কিছু কিছু সংখ্যক প্রত্নলেখে প্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় ভাষা ও প্রাচীন হিট্টীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল খ্রিস্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগেকার।

অনুমান করা হয়, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি রূপ ছিল। যথা — সাহিত্যিক রূপ ও কথ্যরূপ। প্রাচীনতর সাহিত্যিক রূপের দ্বারা ধর্মসাহিত্য রচিত হয়েছিল। বিশেষত ঋগ্বেদের সংহিতা, পরে 'বেদ' গুলি বৈদিক ভাষায় লেখা হয়েছিল। বৈদিক ভাষাই ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন সাহিত্যিক রূপ। অর্থাৎ এটিই প্রথম সাধুভাষা। প্রাচীনকালের বৈদিক ভাষা ছিল মূলত বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের জীবন্ত ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই ভাষার অপর নাম ছান্দস ভাষা।

আর দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপ অপেক্ষাকৃত নবীনতর। এটি সেকালের শিষ্টভাষা অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের এবং লৌকিক আখ্যান উপখ্যানের ভাষা। তবে বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ মনে করেন কথ্যরূপের তিনটি প্রধান আঞ্চলিক ভেদ গড়ে উঠেছিল। যথা — প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয়।

ক. 'প্রাচ্য' — পূর্ব ভারতের অযোধ্যা, উত্তর-ভারতের পূর্বাঞ্চল, বিহার ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত।

খ. 'উদীচ্য' — উত্তর পশ্চিম ভারত ও উত্তর পাঞ্জাবে অবস্থিত।

গ. 'মধ্যদেশীয়' — পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ দিল্লী, মীরাট, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ওই তিনটি কথ্যরূপ (প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয়) ছাড়াও আর একটি কথ্য রূপ ছিল, যার নাম 'দাক্ষিণাত্য'। মহারাষ্ট্র বা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল এই কথ্যরূপটি। এগুলি সবই কথ্যরূপের আঞ্চলিক উপভাষা। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত পরিবর্তিত হওয়া। তাই প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্যরূপ দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে।

তখন অনেকেই বৈদিক তথা দেবভাষার এই পরিবর্তনকে বিকৃতি মনে করেছিলেন। তাই ভাষার শুদ্ধ মার্জিত রূপের আদর্শ রচনা করার জন্যে ব্যাকরণ রচনা করেন অনেকে। ব্যাকরণের নিয়ম মেনে ভারতীয় আর্যভাষার একটি শুদ্ধরূপ গঠিত হল। সেটি হল সংস্কৃত। মূলত যে ভাষাতে বেদ লেখা হয়েছে, তাকে বলা হয় বৈদিক ভাষা। আর পাণিনির সংস্কার করা আর্য ভাষা হল সংস্কৃত। তবে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা হল প্রাচীন ভাষার দুটি সাধুরূপ। তবে কথ্যরীতির ভাষা বা মুখের ভাষা এর পিছনে অবশ্যই ছিল।

বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্যভাষাই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন। এই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবারে আলোচনার পালা।

৩০১.১.৪.৩ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

ক. প্রাচীন বৈদিক ভাষায় '৯' কার ধ্বনির প্রচলন ছিল। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষে ওই '৯' কার ধ্বনি লোপ পেতে থাকে। শুধু '৯' কার ধ্বনি নয় — ঋ, ৠ এ, ঔ প্রভৃতি স্বরধ্বনিও বেদের পরবর্তী যুগে লোপ পেয়েছে।

খ. বৈদিক ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার খুবই কম ছিল। তবে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার একটু বেশিই ছিল।

গ. বৈদিক ভাষায় স্বরাঘাতের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই স্বরাঘাতের ফলেই শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হত। স্বরধ্বনির এই পরিবর্তন তিনটি ক্রমে হত। যথা—গুণ দীর্ঘ সম্প্রসারণের দ্বারা।

ঘ. বৈদিক ভাষায় দুটি ধ্বনির সম্ভাব্য স্থানে সন্ধি হতোই বৈদিক সংস্কৃতে সন্ধি গভীরভাবে বাধ্যতামূলক ছিল না। যেমন — মনীষা + অগ্নি = 'মনীষা অগ্নি' এখানে সন্ধি করা হলেও চলত, না হলেও চলত। কিন্তু ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে সন্ধি ছিল বাধ্যতামূলক।

ঙ. বৈদিক ভাষাই যুক্তব্যঞ্জনের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ছিল। যেমন — ক্র, র্দ্ধ, ৎস্ন ইত্যাদি। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় অনেক যুক্তব্যঞ্জন সমীভূত হয়ে গেল এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ওই যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল।

৩০১.১.৪.৪ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

ক. বৈদিক ভাষায় শব্দরূপের বৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি। যেমন- 'নর' শব্দের দ্বিবচনে ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের প্রথমা ও দ্বিতীয় বিভক্তিতে একটি রূপ 'নরৌ' পাওয়া গেলেও বৈদিকে আরও একটি রূপ 'নরা' পাওয়া যেত।

খ. বৈদিকে ক্রিয়ার ভাব ছিল পাঁচটি। যথা — নির্দেশক (Indicative), অনুজ্ঞা (Imperative), অভিপ্রায় (Subjective), সম্ভাবক (Optative) এবং নির্বন্ধ (Injunctive)।

গ. মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক ভাষার ক্রিয়ার পাঁচটি কাল ছিল। যথা— লট্ (Present), লৃট (Future), লঙ (Imperfect Past), লিট্ (Past Perfect) ও লুঙ্ (Aorist)। এ ছাড়া এখানে অতীত কালের তিনরকম প্রয়োগ ছিল। যথা — অসম্পন্ন (লঙ), সামান্য (লুঙ) ও সম্পন্ন (লিট)।

ঙ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কারকের সংখ্যা ছিল আটটি। যথা — কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক, সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ। ভিন্ন ভিন্ন কারকের বিভক্তিও আলাদা আলাদা ছিল।

চ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ নেই। দুই পদের মাত্র সমাস হত। পরে সংস্কৃতে সমাসের ব্যবহার খুব বেড়ে গেলে বহু পদময় সমাস সৃষ্টি হয়।

ছ. বৈদিক ভাষায় শর্তৃ, শানচ্ ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াগত বিশেষণ সৃষ্টি করা হত। যেমন — যজ > যজমান।

জ. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতই বৈদিক ভাষায় তিন প্রকার লিঙ্গের ব্যবহার ছিল। যথা — পুং লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ ও ক্লীব লিঙ্গ। তবে লিঙ্গভেদ অনুসারে লিঙ্গভেদ না হয়ে প্রকৃতি নির্দিষ্টভাবে হত।

ঝ. শব্দরূপেও বৈচিত্র্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায়। বচনকে তিন ভাগে এখানে ভাগ করা হয়েছিল। যথা — একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। তবে শব্দরূপের থেকে ক্রিয়ারূপে বৈচিত্র্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বেশি ছিল। বাচ্যকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা — কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য। এ ছাড়া অসমাপিকা পদের ব্যবহার ও বৈদিক ভাষায় ছিল। পুরুষ ছিল তিন প্রকার। যথা — উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ।

ঞ. বৈদিক শব্দরূপে অতিরিক্ত পদও ছিল।

ট. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় উপসর্গ শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েই ব্যবহৃত হত না। স্বাধীনপদ রূপেও উচ্চারিত হত।

ঠ. বাক্যে কোন্ পদ আগে, কোন্ পদ পরে বসবে সে সম্বন্ধে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ছিল না। এখানে কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে ধাতু ও শব্দ থেকে নতুন পদ গঠিত হত।

৩০১.১.৪.৫ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অক্ষরমূলক ছন্দ প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা বিচার করে ছন্দ নির্ণয় করা হত। তবে পরবর্তীতে যে মাত্রামূলক ছন্দরীতির প্রয়োগ দেখা যায়, তার সঙ্গে এই অক্ষরমূলক ছন্দের একটা পার্থক্য ছিল। মাত্রামূলক ছন্দ পদ্ধতিতে অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে নয়, অক্ষর উচ্চারণের কাল বা মাত্রা অনুসারে ছন্দ নির্ণয় করা হত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে পরবর্তী স্তরের অনেক শব্দ ও বাক্‌রীতি এসেছে, যেগুলিকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় নিজস্ব বলে গ্রহণ করা যায়নি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তার আসলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মধ্যেও আছে এবং প্রাকৃত স্তরেও এসেছে।

৩০১.১.৪.৩ : মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

বৈদিক ও সংস্কৃত ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি কথ্যরূপ লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এই কথ্যরূপটি প্রায় হাজার বছর ধরে কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। এই কথ্যরূপের কিছু কিছু নিদর্শন আছে অবৈদিক নানা শাস্ত্র ও পুরাণে। এ ছাড়া বৌদ্ধদের ব্যবহৃত গাথা ভাষাতেও এই কথ্যরূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব বুদ্ধবচনের ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার খুব কাছাকাছি হলেও বৌদ্ধিক বা সংস্কৃত নয়। বৌদ্ধরা এই ভাষার নাম দিয়েছেন পালি। এটি লিখিত সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভাষা হিসেবে এখনও নানা দেশে এ ভাষার চর্চা করা হয়। তবে এর প্রাথমিক রূপের ভিত্তি ছিল সমকালীন ও প্রাচীন ভারতীয় কথ্যভাষা থেকে আলাদা। অর্থাৎ এই সময় থেকে ভারতীয় আর্যভাষীর অন্য এক যুগের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। এই যুগটির নাম দেওয়া হয় 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ' । ৬০০ খ্রি: পূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রি: পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতিকাল।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম ভাগে পালি ভাষার উদ্ভব ঘটে। পালি ভাষা সাধুরীতির সাহিত্যিক ভাষা হওয়া সাধারণের জন্য উপযুক্ত হয়নি। তবে বুদ্ধদেবের 'সকায় নিরুত্তিয়া' পালি ভাষায় রচিত। অনুমান করা হয় অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত ভাষা থেকে পালি ভাষার উদ্ভব ঘটে।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যভাগে সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব ঘটে এবং তৃতীয় স্তরের ভাষা অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ এই দুটি ধারায় বিবর্তিত হতে থাকে। সুতরাং বোঝা যায় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কাল বিস্তৃত। এই কালের মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই কারণে এই যুগটিকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা —

(ক) প্রাচীন বা প্রথম স্তর

(খ) মধ্য বা দ্বিতীয় স্তর

(গ) অন্ত্য বা তৃতীয় স্তর

১. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার — প্রথম স্তরের কালসীমা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম স্তরটি ছয়শো বছর স্থায়ী হয়েছিল।

২. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরের কালসীমা খ্রিস্টিয় প্রথম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ দ্বিতীয়-পর্যায়টিও ছশো বছর স্থায়ী হয়েছিল।

৩. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের কালসীমা খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টিয় দশম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এই তৃতীয় পর্যায়টি চারশো বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান ভাষা হল প্রাকৃত ভাষা। তবে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত, মিশ্র সংস্কৃত ও পালিও এই যুগে পড়ে। সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণির পুরুষের সংলাপে প্রাকৃত ভাষ্য ব্যবহৃত হয়েছে। জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিও এই প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি এই প্রাকৃত ভাষাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছে। যথা — (ক) মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত (খ) শৌরসেনী প্রাকৃত (গ) মাগধী প্রাকৃত (ঘ) পৈশাচী প্রাকৃত ও (ঙ) অর্ধমাগধী প্রাকৃত। ব্যাকরণবিদদের মতে মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত হল মূলত প্রাকৃত। সংস্কৃত নাটকের নারী চরিত্রের গানগুলি মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত গাথা-সপ্তসতী ইত্যাদি গ্রন্থের ভাষাও এটি।

শৌরসেনী প্রাকৃত হল সংস্কৃত নাটকের নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলির সংলাপের ভাষা। শুরসেন অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান মথুরা অঞ্চলে এই ভাষার প্রচলন ছিল। এই ভাষা শক্ ও হুনদের শাসনকার্যে ব্যবহৃত হত। সংস্কৃতের সঙ্গে এর যোগ ছিল নিবিড়।

মাগধী প্রাকৃতও সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত হত। তবে নিচু জাতির চরিত্রগুলির মুখে এই মাগধী প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হত। এই ভাষা ছিল মূলত হাস্যরসাত্মক। অশ্ব ঘোষের নাটকে এই মাগধী প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা গেছে। এরই অন্তর্গত ভাষা হল শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী ইত্যাদি।

পৈশাচী প্রাকৃত ছিল লোকসাহিত্যের ভাষা। আভিধানিক অর্থে পিশাচদের মুখের ভাষা পৈশাচী প্রাকৃত। তাই সংস্কৃতের মতো উঁচুমানের সাহিত্যে এটি জায়গা পায়নি। অবশ্য গুণাঢ্য তাঁর 'বৃহৎ কথা' গ্রন্থটি পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেন।

জৈনদের গ্রন্থগুলি অর্ধমাগধী প্রাকৃতে লেখা। তাই অর্ধমাগধী প্রাকৃতকে কেউ কেউ বলেন জৈনপ্রাকৃত। এটি মাগধীর প্রতিবেশী ভাষা বলেই অনেকে মনে করেন। জৈন ব্যাকরণবিদ্‌রা মনে করেন অর্ধমাগধী শাস্ত্রের ভাষা।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাকৃতের অন্ত্যস্তর হল অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ। এই ভাষাই নব্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছে। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার এই শেষস্তরকে কেউ কেউ বলেছেন অপভ্রংশের স্তর।

কেউ বলেছেন অপভ্রষ্ট বা অর্বাচীন অপভ্রংশের স্তর। এই অর্বাচীন অপভ্রংশ ভাষা থেকেই উত্তর-ভারতের নানা অঞ্চলে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলি, হিন্দি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠী ও কোঙ্কনী প্রভৃতি নব্য ভারতীয় ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। এই অপভ্রষ্ট ভাষাগুলির মধ্যে কতগুলি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে। সুকুমার সেন অপভ্রষ্ট ভাষাগুলির মধ্যে চৌদ্দোটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন — এই ভাষায় কর্তা ও কর্মের বিভক্তি নেই। এই ভাষার শব্দরূপ সবই একবচনের মতো নয়। তবে দু'একটি প্রাচীন প্রয়োগে কখনও কখনও বহুবচনের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই ভাষার শব্দরূপে লিঙ্গভেদ নেই। অবহট্‌ঠ ভাষার তিন প্রকারের কারক দেখা যায়। যথা — মুখ্যকারক দুটি (যথা — কর্তা ও কর্ম) আর একটি গৌণকারক। এখানে সর্বনামের বহুবচনের পদ কম পাওয়া যায়। এই ভাষার ক্রিয়াপদ। এ ছাড়া এই ভাষায় মাত্রামূলক ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। এখানে যুগ্মব্যঞ্জন খানিকটা সরল ভাবে উচ্চারিত হয়। সমাসের প্রয়োগ ও অর্বাচীন অপভ্রষ্ট ভাষায় কম দেখা যায়।

উপরে যে সব মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কথা বলা হল সেগুলি ছাড়া ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতকেও কালের বিচারে মূলত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে ফেলা যায়। যদিও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এগুলিকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে ফেলা যায়। তবে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের পালি ভাষার বিবর্তন প্রাকৃতের মতো নয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের অনুশাসনের সময় পাহাড়ের গায়ে বা স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে এই পালি ভাষায় নিদর্শন পাওয়া যায়।

৩০১.১.৪.৩.১ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারই '৯' মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় আর রইল না।

খ. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় পদের শেষে অবস্থিত অনুস্বার (ং) রক্ষিত হয়েছে। যেমন— নবম্ > নরং।

গ. এই পর্বে দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হয়ে লোপ পেয়েছে। কখনও কখনও শ্রুতিধ্বনি হিসেবে 'য়' বা 'ব' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন —

সকল > সঅল - সঅল সমাহিঅ।

ঘ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যৌগিক স্বর মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় একক স্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন — অয় > এ

ঙ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন — দীর্ঘ > দিগ্‌ঘ।

চ. এই পর্বে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে শুধু ক্ষ এর পরিবর্তন আলাদা ভাবে হয়েছে। এটি 'কখ' বা 'চছ' ও হয়েছে। যেমন — বৃক্ষ > বৃক্‌খ।

ছ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় পদের শেষে অনুস্বার রক্ষিত হলেও পদের শেষে 'অ' কারের পর অবস্থিত বিসর্গ (ঃ) লোপ পেয়েছে। এবং বিসর্গ কখনও 'ও' কার হয়েছে। আবার কখনও হয়েছে 'এ' কার। যেমন — জনঃ > জন ইত্যাদি।

জ. এ ছাড়া মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় পদের প্রথমে অবস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জন দু-রকম ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যথা—কখনও দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি লোপ পেয়েছে, আবার কখনও বা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মাঝখানে স্বরধ্বনি এসে সেই ব্যঞ্জনকে আলাদা করেছে।

৩০১.১.৪.৩.২ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় তিন প্রকার বচন ছিল। যথা — একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিবচন লোপ পেয়ে একবচন ও বহুবচনের রূপ রইল।

খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বিশেষ্য ও সর্বনামের পার্থক্য থাকলেও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিশেষ্য কখনও কখনও সর্বনামের মতো উচ্চারিত হয়েছে।

গ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বহুবচনে প্রথমা ও দ্বিতীয়ায় স্বরান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে পৃথক হলেও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় এই পার্থক্য লুপ্ত হয়েছিল।

ঘ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় সব ধাতুরই রূপ ছিল ভ্বাদিগণীয় ধাতুর মতো। যদিও প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ক্রিয়ার ধাতু ছিল ত্বাদি, দিবাদী প্রভৃতি।

ঙ. এই পর্বে ক্রিয়ারূপের আত্মনেপদ লোপ পেয়ে গেল। সর্বক্ষেত্রে শুধু ব্যবহৃত হতে লাগল পরস্মৈপদ।

চ. মধ্য ভারতীয় আর্যে লঙ্, লুঙ ও লিট্ — এই তিন প্রকার অতীত কালের মধ্যে লিট্ লোপ পেয়েছিল।

ছ. এই পর্বে পাঁচটির পরিবর্তে ক্রিয়ার ভাব হয়ে গেল তিনটি। যথা — নির্দেশক, অনুজ্ঞা ও সম্ভাবক। কিন্তু লুপ্ত হল ক্রিয়ার অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ভাব।

জ. মধ্য ভারতীয় আর্যে এই কারকের বিভক্তি চিহ্ন লোপ পেল। ফলে বাক্যে পদবিন্যাস অবস্থানের উপর অনেকটা নির্ভর করল।

৩০১.১.৪.৩.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

এই পর্বে আর্যভাষায় মাত্রামূলক ছন্দের ব্যবহার দেখা গেল। অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা নয়, অক্ষর উচ্চারণের কাল-পরিমাপ মাত্রার উপরে ছন্দের বিন্যাস নির্ভর করত। কবিতার চরণগুলি মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিষমমাত্রিক ও সমমাত্রিকের শেষস্তরে চরণের শেষে মিল দেখা গেল।

এখান থেকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সূত্রপাত ঘটেছে। কেউ কেউ আবার মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তরের মধ্যে শেষ স্তরকেই চিহ্নিত করেছে প্রত্ননব্য ভারতীয় আর্যভাষার (Proto-Neo-Indo Aryan) স্তর বলে।

৩০১.১.৪.৪ : নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল অনুমান করা হয় ৯০০ খ্রি: থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। আগের যুগেই প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল। পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণের মাধ্যমে আর্যভাষার সংস্কার করেন। অবশ্য পাণিনির ব্যাকরণের ভাষা সংস্কৃত ছিল, যা মানুষের মুখের ভাষা হতে পারেনি। তাই প্রাকৃত ভাষা ছিল প্রাকৃতজনের ভাষা। ভারতীয় আর্যের কথ্যরূপের মধ্যে ছিল প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয় ভাষা। এগুলিই বিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত ভাষার জন্ম দিয়েছিল। আর মুখের প্রাকৃত থেকেই হল সাহিত্যের প্রাকৃত। এই সাহিত্যের প্রাকৃতের পাঁচটি শাখা ছিল যথা —

(ক) মহারাষ্ট্র প্রাকৃত

(খ) পৈশাচী প্রাকৃত

(গ) শৌরসেনী প্রাকৃত

(ঘ) অর্ধমাগধী প্রাকৃত

(ঙ) মাগধী প্রাকৃত

এই সব প্রাকৃতকে ভিত্তি করে একটা বিশিষ্ট কথ্যরীতির ভাষা গড়ে ওঠে। এই ভাষাগুলিই অপভ্রংশ ও অবহট্‌ট নামে পরিচিত। এর থেকেই পরবর্তীতে বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সমূহের উৎপত্তি হয়েছে। যেমন— মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মারাঠী, গুজরাটী ও রাজস্থানী ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব হয়েছে। পৈশাচী প্রাকৃত থেকে এসেছে পূর্বী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে বঙারু, নেপালী, কনৌজ ইত্যাদি। অর্ধমাগধী থেকে বাখেলী, ছত্রিশগড়ী ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। এ ছাড়া মাগধী প্রাকৃতের দুটি উপশাখা থেকে যথাক্রমে মৈথিলী, ভোজপুরী, মগহী (পশ্চিম শাখা) ও বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া (পূর্ব শাখা) ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছে।

সুতরাং নব্য ভারতীয় আর্যভাষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে দেখা যাবে, এই ভাগের মধ্যে পড়ছে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি। যেমন — প্রথমেই কাশ্মীরি ভাষা, যেটি কাশ্মীরের প্রধান ভাষা। পাঞ্জাবী ভাষার পশ্চিমা পাঞ্জাবী ও পূর্বী পাঞ্জাবী হল নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের ভাষা সিন্ধী (ফার্সি লিপিতে লেখা) হল নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। গুজরাট, মারাঠা ও গোয়া অঞ্চলের কোঙ্কনী ভাষা মারাঠী ভাষার উপভাষা হিসেবে গণ্য হলেও এগুলি স্বতন্ত্র ভাবে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবেই পরবর্তীতে পরিচিত হয়েছে। হিমালয়ের পশ্চিমে ও মধ্যাঞ্চলেও কয়েকটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা অবস্থিত। যেমন — নেপালী, মৈথিলী, কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালী ভাষা। এ ছাড়া ভারতীয় রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি নিঃসন্দেহে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। হিন্দির দুটি ভাগ, যথা (ক) পুর্বী হিন্দি বা কোশলী ভাষাগুচ্ছ, যার মধ্যে আছে অবধী, বাখেলী ও ছত্তিশগড়ী ভাষা। (খ) পশ্চিমা হিন্দি বা খড়ী কেলী, যার মধ্যে পড়ে বঙ্গারু, কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, কনৌজী প্রভৃতি ভাষা। মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী, ওড়িয়া, বাংলা ও অসমিয়া এই ছয়টি ভাষা তো নব্য ভারতীয় আর্যভাষাই।

এ ছাড়া দুটি বহির্ভারতীয় ভাষাকেও নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে ধরা হয়। যথা — শ্রীলঙ্কা বা সিংহলের ভাষা সিংহলী ও যাযাবরদের ভাষা জিপসী বা রোমনি। অনুমান করা হয় প্রাচ্য প্রাকৃতের একটি শাখা খ্রিঃ পূঃ ৪০০ অব্দে সিংহলে চলে যায়। এই শাখা থেকেই 'সিংহলী' ভাষার সৃষ্টি। মাগধীর পূর্বরূপ থেকে এর বিবর্তন হয়েছিল বলে একে মাগধী গোষ্ঠীর ভাষাও বলা হয়। আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি আর্যশাখা ভারতের বাইরে গিয়ে 'জিপসী ভাষা' সৃষ্টি করেছে। এই ভাষাটি পৈশাচী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে ইউরোপের নানা দেশ। যেমন— আর্মেনীয়া, তুরস্ক ও সিরিয়ায় এই 'জিপসি' ভাষা প্রচলিত। এই ভাষায় প্রচুর বাংলা শব্দ, ইউরোপ ও এশিয়ার শব্দ ঢুকে গেছে।

৩০১.১.৪.৪.১ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

ক. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ্মব্যঞ্জন নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সরল হয়েছে এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন — নচ্চ > নাচ, পক্ক > পাক ইত্যাদি। তবে পাঞ্জাবীতে যুগ্মব্যঞ্জন থেকেই গেছে। যেমন — রত্ত্, কর্ম্ম্। আবার সিন্ধীতে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়নি। যেমন — রতু ইত্যাদি।

খ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় নাসিক্য যুক্তব্যঞ্জনের নাসিক্য ব্যঞ্জনটি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে স্বস্থানে লুপ্ত হয়েছে। ফলে যুক্তব্যঞ্জন সরল হয়েছে ও আনুনাসিক স্বরধ্বনিটি দীর্ঘ হয়ে গেছে। যেমন — সন্ধ্যা > সঞ্ঝা, দন্ত > দাঁত।

কিন্তু সিন্ধীতে নাসিক্য যুক্তব্যঞ্জন রয়েই গেছে। যেমন—

হস্ত > হথ্ (পাঞ্জাবী)

হস্ত > হথু (সিন্ধী)

গ. এই পর্বে পদান্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত অথবা বিকৃত হয়েছে। যেমন—দধি > দহী।

তবে ওড়িয়া ভাষায় এই নিয়ম অনেকটা রক্ষিত।

ঘ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় স্বরমধ্যবর্তী স্পর্শ ব্যঞ্জনের এর পরিণতি মোটামুটি তিন রকমের। যথা —

১. সন্ধি সূত্রে — গঅ + ইল্ল > গেল (বাংলা, অসমীয়া ইত্যাদি)

২. একটির লোপ হয় — ঘৃত > ঘিঅ > ঘি (বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি)

৩. দ্বিঘরে পরিণত হয় — মধু > মউ > মৌ (বাংলা)

৩০১.১.৪.৪.২ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

ক. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় পদান্তের স্বরধ্বনি লুপ্ত হওয়ার জন্য লিঙ্গ পার্থক্যের চিহ্নও লুপ্ত হয়েছিল, যেমন—গুজরাটি ও মারাঠিতে ক্লীবলিঙ্গ রয়ে গেল। যেমন—দধি > দহি। সিংহলীতে নতুন করে দুটি লিঙ্গের সৃষ্টি হল। যথা—সপ্রাণ ও অপ্রাণ। আর হিন্দিতে নতুন করে স্ত্রীলিঙ্গের জন্য বিভক্তি এল।

খ. এই পর্বে স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন শব্দরূপের সব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল। ফলে অনুসর্গজাত কিছু শব্দ, নতুন কারক বিভক্তি হিসেবে যোগ হল। অবশ্য কর্তৃকারক, করণকারকের বিভক্তি রয়েই গেল। আবার সম্বন্ধ পদের একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি রয়ে গেল কোনও কোনও ক্ষেত্রে। যেমন—সংস্কৃত চৌরস্য > চুরস-কাশ্মীরি, চোরেস-জিপসী

গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় কারক মুখ্যত দুই প্রকার। যথা—মুখ্যকারক ও গৌণকারক। মুখ্য কারকে শূন্য বিভক্তি। আর গৌণকারকে ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি যোগ করে তার অনুসর্গ যোগ করা হল। কর্মকারক ও কর্তৃকারকে বিভক্তি আগেই এক হয়ে গিয়েছিল।

ঘ. এই পর্বে ভাষাগুলির মধ্যে কাল ও ভাবের মধ্যে কেবল কর্তৃবাচ্য, কর্ম-ভাব-বাচ্যে অনুজ্ঞা ভাবের রূপগুলি বজায় আছে। ভবিষ্যৎ কালের রূপও কোনও কোনও ক্ষেত্রে রয়ে গেছে। প্রায় সবক্ষেত্রে নিষ্ঠা প্রত্যয় যোগে ও ইংরেজি যোগে অতীত কালের পদ নির্মিত হয় ও শর্তৃ প্রত্যয় যোগে ভবিষ্যৎ কালের রূপ গঠন করা হয়েছে।

ঙ. এই পর্বে বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম প্রভৃতি পদের স্থান প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই স্থান পরিবর্তন করলে বাক্যের অর্থ বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। যেমন—মানুষ কোনও কোনও বন্যপ্রাণী খায়। এখানে কর্তা—মানুষ, বাক্যের আদিতে বসেছে। কিন্তু যদি বলা হয় কোনও কোনও বন্যপ্রাণী মানুষ খায় এখানে কর্তার বদল হয়ে যাওয়ার ফলে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

চ. এখানে মুখ্যকারকে একবচন ও বহুবচনের পার্থক্যসূচক বিভক্তিগুলি প্রায় সব ভাষাতেই লুপ্ত হয়েছে। ফলে বহুত্ববোধক শব্দ অথবা সম্বন্ধপদের বহুত্ববাচক বিভক্তি কাজে লাগানো হয়ে থাকে। অবশ্য সিন্ধী, মারাঠী ও পশ্চিমা হিন্দিতে এর ব্যতিক্রম নিয়ম দেখা যায়।

ছ. এই পর্বে একাধিক ধাতুর সংযোগে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ারূপ দেখা দিল।

যেমন—√ কর + ইয়া (ঐ + √ আছ্ + এ = করেছে। এখানে 'কর' ও 'আছ' দুটি ধাতু মিলে একটি ক্রিয়া গঠিত হয়েছে।

জ. নব্য ভারতীয় আর্যে পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলিতে কর্মবাচ্যের রূপ বদলে কর্তৃবাচ্যের রূপ পেয়েছে। যেমন—অস্মাভিঃ পুস্তিকা পঠিতা (কর্মবাচ্য) > আমি পুঁথি পড়ি (কর্তৃবাচ্য)

৩০১.১.৪.৪.৩ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দ মাত্রামূলক ও সমাপিকা। তার সঙ্গে অন্ত্যানুপ্রাস এসেছে। অতি আধুনিককালে গদ্যছন্দের ব্যাপক প্রচলনের ফলে সমমাত্রিক অনুপ্রাস যুক্ত ছন্দোরীতির অবশ্য অচল হয়ে গেছে। মোট কথা বাংলার ক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্ত, দলবৃত্ত, অমিত্রাক্ষর, মিত্রাক্ষর, পদ্য ইত্যাদি ছন্দের আগমনে সমৃদ্ধ।

৩০১.১.৪.৫ : সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা

মানুষ নিজের অজান্তে ভাষার পরিবর্তন করে ফেলে। পরিবর্তন কিন্তু একদিনে সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন গত বিশ বছরে এই পরিবর্তন অস্বাভাবিক ভাবে হয়েছে। বাংলা ভাষার এই পরিবর্তনকে সামনে রেখে আমরা একটা নাম দিতে পারি এই পর্বের। সেটা হল অত্যাধুনিক বাংলা। এই বাংলা ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্যগঠনগত ও ছন্দোগত পরিবর্তনগুলি আলোচনা করা হল।

৩০১.১.৪.৫.১ : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. এই বাংলায় স্বরসঙ্গতি ছাড়াও ব্যঞ্জনধ্বনির কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়।

যেমন — বাড়িওয়ালা > বাড়িঅলা, ফেরিওয়ালা > ফেরিঅলা ইত্যাদি।

২. শব্দদ্বৈতের মাধ্যমে নিত্য নতুন শব্দ তৈরি করে তা বাক্যে ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। যেমন—

ক. দিন দিন যা শুরু হয়েছে।

খ. রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

৩. কম্পিউটার প্রযুক্তি আসার ফলে ছাপার অক্ষরে স্পষ্ট রূপ, কখনও যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি স্বচ্ছ হয়েছে।

৪. তৎসম শব্দ ছাড়া প্রায় সব শব্দেই 'ঈ'-কারের বদলে 'ই'কার, মূধন্য (ণ)-এর পরিবর্তে দন্তন্য (ন), 'ষ'-এর পরিবর্তে 'শ' বা 'স' -এর ব্যবহার লক্ষণীয়।

যেমন — ট্রেণ > ট্রেন, বাড়ী > বাড়ি, মাষ্টার > মাস্টার ইত্যাদি।

৫. খণ্ড-ৎ-এর ব্যবহারও একদম তলানিতে ঠেকেছে। যেমন—

কদাচিৎ > কদাচিত, উচিৎ > উচিত প্রভৃতি।

৬. অসমীভবন প্রক্রিয়ায় সমব্যঞ্জনার লোপ এই পর্বে ঘটে চলেছে। যেমন—

অভিভাবক > অবিভাবক, পৌঁছেছে > পৌঁচেছে ইত্যাদি।

৩০১.১.৪.৫.২ : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. খণ্ডিত শব্দের ব্যবহার এই পর্বে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন— মাইক্রোফোন > মাইক, ইউনিভারশিটি > ভারসিটি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন > অ্যাডমিন > অ্যাডাম ইত্যাদি।

২. এই পর্বে ইংরাজি-বাংলা শব্দ দিয়ে যৌগিক পদ তৈরি করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে এগুলি কিন্তু যৌগিক ক্রিয়াপদ নয়। যেমন— তদন্ত কমিশন, প্যাকেজ নাটক, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতি।

৩. ইংরাজি সহ বিভিন্ন ভাষা থেকে অসংখ্য শব্দ তো এই ভাষাতে আসছেই, তবুও নিত্যনতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে। যেমন —

বিন্দাস, ফান্ডা, মালটিন্যাশনাল, ওয়ান স্টপ প্রভৃতি।

৪. বিশেষ্যের সংক্ষিপ্তকরণ করা এই পর্বের বাংলার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেমন—

আনন্দবাজার পত্রিকা > এবিপি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় > ক.বি, ইন্দিরা গান্ধি ওপেন ইউনিভার্সিটি > ইগনু ইত্যাদি।

৫. বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কিছু বিদেশি শব্দ যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন— চেক করা, ট্যাকস দেওয়া, বুক করা প্রভৃতি।

৩০১.১.৪.৫.৩ : ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

অত্যাধুনিক বাংলা ভাষার ছন্দ আগের চেয়ে অনেক স্বচ্ছন্দ হয়েছে। সব ছন্দকে বাইরে ফেলে গদ্য ছন্দ একচ্ছত্র রূপ নিয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মারা যাবার পর জয় গোস্বামী লিখেছেন—

'বিরোধিতা করলাম অনেক।
তোমার সুস্পষ্ট বিরোধিতা
আজও, তোমার মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে
মনে হয় ভুল-ই করেছি। ....

(২৫ অক্টোবর, ২০১২ : জয় গোস্বামী)

অত্যাধুনিক বাংলার ছন্দ যে কথা বলে তা সুনীল কবিতাতেও স্পষ্ট।

নির্ভেজাল বাংলা গদ্য ছন্দের কবিতা—

' হে প্রথম লাইন, এসো, খাতা ও কলম নিয়ে
বসে আছি, এসো
আকাশে রঙিন মেঘ, বজ্রগর্ভ, বিদ্যুতের এক
ঝটিকার মতন, এসো',

(হে প্রথম লাইন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৩০১.১.৪.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল কত?

২। ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাজন করো।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৫। এই পর্বের ছন্দগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

৬। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস বর্ণনা করো।

৭। এই পর্বের আর্যভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

৮। এই পর্বের আর্যভাষার রূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৯। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্বরূপ বর্ণনা করো।

১০। এই পর্বের ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

১১। ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস নির্ণয় করে যুগবিভাজন করো।

১২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে কী বোঝো? এই ভাষার বৈশিষ্ট্যাবলী লেখো।

১৩। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সময়সীমা অনুযায়ী এর স্তর বিভাজন করো।

১৪। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

১৫। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বলতে কী বোঝো? এই ভাষার সময়সীমা ও নিদর্শন উল্লেখ করে বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

১৬। প্রাচীন বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

১৭। আদি-মধ্য-বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

১৮। অন্ত্য-মধ্য-বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

১৯। আধুনিক বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৩০১.১.৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ড. রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯০, পৃষ্ঠা ৫৪৬।

২। ড. শ্রীকুমার বিশ্বাস, ভাষাবিজ্ঞান পরিচয়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১১৪।

৩। সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৬), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৪। মহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষায় ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স।

৫। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৬। ভাষার দেশ কাল—পবিত্র সরকার।

৭। ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী—রফিকুল ইসলাম।

৮। বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত—মহম্মদ শাহীদুল্লাহ

৯। ভাষাবিদ্যা পরিচয়—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১০। ভাষাতত্ত্ব—রফিকুল ইসলাম।

১১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩) — ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

১২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬) — সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

১৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭) — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

১৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬) — রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

১৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮) — মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।

১৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

১৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

১৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০) — পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

১৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮) — রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

২০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪) — অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

২১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

২২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

২৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১) — নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

২৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭) — ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

২৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮) — অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

২৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪) — আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

২৭। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গাল ব্যাকরণ

২৮। সুকুমার সেন : ভাষায় ইতিবৃত্ত

২৯। ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৩০। পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৩১। সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৩২। সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৩৩। ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৫

বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.২.৫.১ : ভূমিকা

৩০১.২.৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৫.১ : ভূমিকা

অনেকে বলেন খ্রি: পূ: যুগেও বাঙালির অস্তিত্ব ছিল। শুধু ভারতে নয়, এখনকার পাকিস্তান, আফগানিস্থান ইত্যাদি দেশেও। তাই যদি হয়, তবে বলা যাবে বাঙালিরা একবিংশ শতকেও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। পৃথিবীর সব প্রান্তেই এখন বাঙালির জয়জয়কার। সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সবকিছুতেই বাঙালি চলে এসেছে প্রথম সারিতে। এমনকী লোকসংখ্যার বিচারেও। ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে তো পৃথিবীতে চতুর্থ স্থানে রয়েছে এই বাংলা ভাষা।

বাঙালি একটি মিশ্র জাতি। এই ভারতে তথা বাংলায় আর্য আসার পরেই তারা তাদের মৌলিকতা হারিয়েছে। আমরা তো সবাই জানি আর্যরা আসার আগে এই ভারতের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বসবাস করত অনার্যরা। অর্থাৎ দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভোট-চীনীয় ইত্যাদি বংশের মানুষজন। এই আর্যরা বঙ্গভূমিতে এসে সবাই যে একেবারেই বাঙালি হয়ে গেল তা হতে পারে না। বরঞ্চ হতে পারে বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী অনার্যরা, আর্যদের সংমিশ্রণে বাঙালি হয়ে গিয়েছিল। এই মিশ্রণ কিন্তু একদিনে হয়নি, অনেকদিন ধরে চলেছিল। বিবাহসূত্রে রক্ত মিশ্রণের পাশাপাশি সংস্কৃতির মিশ্রণও হয়েছিল এইরকম অনুমান করা হয়।

'বঙ্গ' শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে সেই কবেকার বেদের যুগে। মূলত ঐতরেয় আরণ্যকে। এই বঙ্গে যারা বসবাস করত তারাই বঙ্গবাসী বা বাঙালি। বঙ্গদেশের যে প্রধান নদী গঙ্গা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খ্রিস্টপূর্ব যুগে বিদেশি লেখকদের লেখা 'আরগনটিকা', 'জর্জিকাস' প্রভৃতি গ্রন্থে 'গঙ্গা-রাঢ়' দেশের নাম আছে। আছে এখানে বসবাসকারী মানুষদের বীরত্বের কথা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় খ্রিস্টপূর্ব যুগেই বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তাদের ভাষা বাংলা কি না তা কোথাও লেখা নেই। সিন্ধু সভ্যতার বিবরণে যে সব সিলমোহর পাওয়া গেছে তাতেও আছে বাঙালি সংস্কৃতির চিহ্ন। অর্থাৎ বাঘ সিংহের ছবিই বিশেষজ্ঞদের এই ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এ ছাড়া ওখানকার মানুষদের সর্ষের তেলের ব্যবহার বাঙালি মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সভ্যতার মানুষদের রেশমবস্ত্র, চাল, মাছ ইত্যাদির ব্যবহার দেখে অনুমান করা হয়, এখানেও বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়া ছিল।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণে অঙ্গ, বঙ্গ মগধ ইত্যাদির কথা আছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বঙ্গকে দেশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ব্যাসদেব তাঁর মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম-এর কথা বলেছেন। এখানে বঙ্গ কোনও দেশের নাম নয়। বঙ্গ হল রানি সুদেষ্ণার পুত্র। কালিদাসের রচনায় তো দক্ষিণ রাঢ়ের কথা আছেই, চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙও তাঁর রচনায় বঙ্গদেশ, বাঙালি ইত্যাদির উল্লেখ করে গেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় এই বিশাল ভূখণ্ডে বাঙালি যেমন ছিল, তাদের ভাষাও নিশ্চয় একটা ছিল। কিন্তু সেটা কোন ভাষা সেটাই প্রশ্ন।

বিশেষজ্ঞদের অনুমানে সেইসময়ের বাঙালিরা নিশ্চিতরূপেই ছিল বীরত্বের বাঙালি। তাদের জীবিকা হিসেবে নীহাররঞ্জন জানিয়েছেন, কৃষিকাজই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। নদীমাতৃক বাংলাদেশে কৃষিকাজকেই তারা বেছে নিয়েছিল। তবে এর পিছনে ছিল আর্যরা। এরাই যেহেতু অনার্য (অস্ট্রিক) বঙ্গবাসীদের আর্যে রূপান্তরিত করেছিল, তেমনই কৃষিকাজেও হাত মিলিয়েছিল। অনার্য অস্ট্রিকরা আর্য হয়ে গেলেও কিন্তু অস্ট্রিকদের পুজো-আচ্চা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ছাড়তে পারেনি। 'আর্য-বাঙালি' উৎসের পিছনে অনেকে আবার অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মিশ্র সংস্কৃতির স্রোতও দেখতে পেয়েছেন। যাই হোক আর্য হয়েও এই বাঙালিরা কিন্তু অনার্য সংস্কৃতির গাছ, পাথর ইত্যাদি পুজোর ব্যাপারটা ছাড়তে পারেনি। শুধু তাই নয়, বিয়ে-অন্নপ্রাশন বিভিন্ন উৎসবের আচার-আচরণ তো অনার্যভাবনা থেকেই প্রসূত। তাই অনেকে বলেছেন অনার্যদের না পালটে আর্যরাই অনার্যদের ধর্ম, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে নিজের করে নিয়েছিল। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এখানকার বাঙালি জাতির উদ্ভব হিসেবে সেই অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠী বা অস্ট্রিকভাষী মানুষদেরই দায়ি করেছেন। এখানকার বাঙালিরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আচার-আচরণ রীতিনীতি সচল রাখলেও ভাষাটা কিন্তু তারা পেয়েছিল আর্যদের। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার স্পষ্টই বলেছেন—

> "... অনার্য্যের ধর্ম মরিল না, অনার্য্যের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্য্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতা বাদে, পৌরাণিক পূজা দিতে, যোগচর্য্যার তান্ত্রিক মতবাদ ও অনুষ্ঠানে আর্য্যদের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য্য ও অনার্য্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলিইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্রবয়ন করা হইল। উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরের আর্য্য সভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতার আর্য্য অপেক্ষা অনার্য্যের দানই অনেক বেশি, কেবল আর্য্যদের ভাষা ইহার বাহন হইল।"

অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাও বেঁচে আছে মানুষের মুখে, লেখকের লেখায়। বিভিন্ন উপভাষাকে টপকে বাংলা বেঁচে আছে আদর্শ কথ্য বাংলায়। শিষ্টজনের মুখে, পত্র পত্রিকায়, লেখকের রচনায়।

ঐতিহাসিকদের মতে, বাংলা ভাষার মূলে আছে আর্যরা। অনুমান করা হয় খ্রি: পূ: ১৫০০ অব্দে আর্যরা ভারতবর্ষে আসে। সেই সময় ভারতে বসবাস করত অনার্যরা। তাদের ভাষা, আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া খুব উন্নত ছিল না। বুদ্ধিও সেইরকম ছিল না। এই সুযোগটাই নিয়েছিল আর্যরা। আস্তে আস্তে তাই তারা দখল নিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষ। আর্যদের বৃত্তি ছিল পশুপালন করা। যাযাবরী কায়দায় তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ালেও, তাদের ভাষা ও সাহিত্য ছিল খুবই শক্তিশালী। ফলে অনার্যদের উপর প্রভাব ফেলতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে তারা আস্তে আস্তে পুরো ভারতবর্ষের উপর প্রভাব ফেলতে থাকে।

বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাষাগত অনেক পার্থক্য ছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে মিলটাই ছিল বেশি। অনুমান করা হয় তারা কথা বলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায়। তারা প্রথম দিকে রচনা করেছিল বিভিন্ন ধরনের দেব গীতামূলক কাব্য। যেমন— ঋগ্বেদ সংহিতা, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি। যাই হোক এই বৈদিক দেবগীতিমূলক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর হঠাৎ করে হয়নি। এর জন্যে অনেক সময় লেগেছিল। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেটা প্রায় আড়াই হাজার বছর।

৩০১.২.৫.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিস্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩০১.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করো।

২. অধ্যাধুনিক বাংলা ভাষার সময়কাল, নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

একক - ৬

প্রাচ্য গোষ্ঠীর ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.২.৬.১ : মূল আর্যভাষাবংশ ও তার শ্রেণিবিভাগ

৩০১.২.৬.২ : কেন্তুম্ ও সতম্ ভাষাবর্গ

৩০১.২.৬.৩ : বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস

৩০১.২.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.২.৬.১ : মূল আর্যভাষাবংশ ও তার শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষা সেই সুদূর প্রত্নভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষাবংশ থেকে সৃষ্ট। এই সুদূর প্রাচীন ভাষার সৃষ্টি কোনো্ ভাষা থেকে এর নিদর্শন আজও অনাবিষ্কৃত। আবার এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল তাও পারস্পরিক মতভেদে কন্টকিত। একদল পণ্ডিত মনে করেন এই ভাষাগোষ্ঠীর বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায়, অন্যদলের ধারণা এঁদের বাসস্থান ছিল মধ্য ইউরোপ। আবার সাম্প্রতিককালে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এখনকার পণ্ডিতেরা মনে করেন রাশিয়ার ইউরাল বা উরাল পর্বতের দক্ষিণে, দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া ও কিরগিজস্থানের ঊষর অঞ্চলই ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান।

আনুমানিক ২৫০০ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই ভাষাগোষ্ঠীর অধিবাসীগণ ক্রমে উপরে কথিত অবস্থান থেকে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপে প্রায় দীর্ঘ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে এই ভাষাগোষ্ঠী স্বতন্ত্র চিহ্নিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আহরণ করে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এই ভাষাগোষ্ঠী থেকে ১০টি ভাষাশাখার সৃষ্টি হয়। এগুলি হল--ইন্দো-ইরানীয়, কেলতিক, ইতালিক, জার্মানিক বা টিউটনীয়, গ্রীক, আর্মেনীয়, আলবানীয়, বালতোস্লাভিক, তুখারীয় এবং হিত্তিয়।

৩০১.২.৬.২ : কেন্তুম্ ও সতম্ ভাষাবর্গ

ভাষাবিজ্ঞানীরা উপরের এই দশটি ভাষা শাখাগুলিকে একটি বিশেষ ধ্বনির সাম্য ও বৈষম্যের ভিত্তিতে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন--কেন্তুম্ বর্গ ও সতম্ বর্গ।

কেন্তুম্ বর্গ : মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি পরবর্তীকালে গ্রীক, ইতালিক, কেলতিক, টিউটনিক, তোখারীয় এবং হিত্তিয় ইত্যাদি ভাষাশাখায় পশ্চাৎকণ্ঠ বা স্নিগ্ধতালব্য হয়ে গেছে । এই সাদৃশ্যের কারণে এই ভাষা শাখাগুলিকে কেন্তুম্ বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সতম্ বর্গ : মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি পরবর্তীকালে ইন্দে-ইরানীয়, বালতোস্লাবিক, আলবানীয় ও আর্মেনীয় ইত্যাদি ভাষায় শিস্‌ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এই সাদৃশ্যের কারণে এই ভাষাশাখাগুলিকে সতম্ বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সত্‌ম বর্গের শাখাগুলির মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ সমৃদ্ধ হল ইন্দো-ইরানীয় ভাষা। এই ভাষা শাখা আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এর এক অংশ প্রবেশ করে ইরান, অপর অংশ ভারতে। ইরানে যে শাখাটি প্রবেশ করে তার প্রাচীনতম ভাষা নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন পারসিক ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা' ও হখামেনীয় সম্রাটদের প্রাচীন প্রত্নলিপিতে। অন্যদিকে ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম ভাষা নিদর্শন পাওয়া যায় ঋক্‌বেদে। স্বাভাবিকভাবেই ভাষাবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইরানীয় আবেস্তা ও বেদের ভাষা নিবিড় সাদৃশ্যে সম্পৃক্ত।

৩০১.২.৬.৩ : বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস

ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋক্‌বেদের রচনাকাল কখন তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থ রচনার সময়সীমা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। বেদের চারটি অংশ---ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি করে ভাগ- সংহিতা (মূলমন্ত্রভাগ), ব্রাহ্মণ (যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি-নিয়ম এবং ব্যাখ্যা), উপনিষদ (আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব) এবং আরণ্যক (গূঢ়তর দার্শনিকতত্ত্ব)। এর মধ্যে ঋক্‌বেদের সংহিতা অংশ প্রাচীনতম। কোনো কোনো ভাষাবিদ্ মনে করেন, 'এই সংহিতা অংশই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রামাণ্য দলিল'[১]। কিন্তু এর অন্যমতও আছে। "বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ লইয়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য দর্শনের যে নির্দশন পাই, তাহাই বৈদিক আর্যভাষা। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে আমরা বৈদিক ভাষা ও পরবর্তীকালের সংস্কৃত ভাষা, উভয় ভাষাকে গণ্য করিয়া থাকি।"[২] তবে মনে হয় প্রথম মতটির সারবত্তা বেশি। ভারতে আগমনকালে আর্যদের ভাষা ছিল বৈদিক ভাষা, বৈয়াকরণ পাণিনি যাকে 'ছান্দস' বলে অভিহিত করেছেন। কালক্রমে এই বৈদিক বা ছান্দস ভাষার পরিবর্তন হতে থাকে। নানাবিধ লৌকিক বিকৃতি থেকে বৈদিক আর্যভাষাকে রক্ষা করার জন্য তখন প্রচলিত আর্যভাষার যে সংস্কার সাধন করা হয়েছিল তাই সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত তাই একটি কৃত্রিম ভাষা। এর ব্যতিরেকে সে সময় জনগণ যে জীবন্ত ভাষায় পারস্পরিক মনের ভাব আদান-প্রদান করতেন সেটিই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা।

প্রকৃতির দিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ছিল 'dynamic' বা গতিশীল । গতিশীল এই জীবন্ত ভাষা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে লোকমুখে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলছিল। এবং আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই এই ভাষার কথ্যরূপের চারটি আঞ্চলিক পৃথক রূপ (প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য) গড়ে উঠেছিল। এতে রক্ষণশীল বৈদিক সংস্কৃতির ধারক ব্যক্তিবৃন্দ দেবভাষার (বেদের ভাষাকে তাঁরা দেবতার ভাষা বা দেবভাষা বলে মনে করতেন) বিকৃতি হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করে এই ভাষাকে একটি নিয়মের সূত্রে বাঁধার জন্য ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন অনুভব করলেন। পাণিনি ছিলেন এই দলের পুরোধা। তিনি

ছিলেন পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দের উদীচ্য অঞ্চলের কথ্যভাষী অধিবাসী। তাঁর সময়ে শিক্ষিত বিদগ্ধ আর্যদের কেন্দ্রভূমি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল মধ্যদেশ। পাণিনি তাই এই মধ্যদেশের বিদগ্ধ ও শিক্ষিত আর্যদের মুখে ব্যবহৃত শুদ্ধ আর্যভাষাকে ভিত্তি করে তার সঙ্গে নিজের বসবাস এলাকার উদীচ্য উপাদান মিশিয়ে পঞ্চম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণে শুদ্ধ সংস্কৃতের রূপটি বিধিবদ্ধ করেন। 'মূলত পাণিনি কর্তৃক মার্জিত এই সংস্কৃতই সংকীর্ণ অর্থে 'সংস্কৃত ভাষা' যা সাধারণত ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত বা লৌকিক সংস্কৃত নামে পরিচিত'[৩]। স্বাভাবিকভাবেই পাণিনি নির্দেশিত সংস্কৃত ভাষা বৃহত্তর প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে সরে এসে একটি কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হয়ে যায়। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার চারটি আঞ্চলিক কথ্যরূপ (প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য) লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে অন্য স্তর মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছয়।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় পরিবর্তনের প্রথম স্তরে 'প্রাচ্য' এই কথ্যরূপ থেকে দুইরকম কথ্যরূপ প্রাচ্যা প্রাকৃত ও প্রাচ্য-মধ্য প্রাকৃতের জন্ম হয়। এই সময় আগের স্তরে সরে যাওয়া সংস্কৃত ভাষা ক্রমশ সাহিত্যের ভাষারূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাহলে বলা যায় ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত যখন সাহিত্যের ভাষারূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তখন বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। স্বাভাবিকভাবেই তাই জনসাধারণের এই জীবন্ত ভাষাস্রোত থেকে সংস্কৃত যত দূরে গেছে ততই তা নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। তাই অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বিশাখ দত্ত, শূদ্রক, বাণভট্ট প্রমুখ প্রতিভাবান কবি ও নাট্যকার সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চা করলেও এ ভাষা খোলস ছেড়ে আর বেরিয়ে আসতে পারেননি। কাজেই মধ্য ভারতীয় আর্যভাষান্তরের প্রথম ভাগে জনসাধারণের মুখের ভাষা প্রাকৃতেরই বিবর্তন ঘটেছে। প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে প্রাচ্যা প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে মাগধী সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হয়েছে। অতঃপর বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে মাগধী সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে জন্ম নিয়েছে অপভ্রংশ এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে তা পরিবর্তিত হয়েছে অবহট্‌ঠে। এরপর মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগ অর্থাৎ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে প্রবেশ করে।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় প্রাচ্যা থেকে জাত মাগধী প্রাকৃত এবং মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম অনুমান করা যায়। কিন্তু মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ড: পরেশচন্দ্র মজুমদার তাই বাংলা ভাষা আদর্শ কথ্য প্রাকৃত থেকে সৃষ্টি বলে মনে করেন। কিন্তু গ্রীয়ার্সন, ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ মনে করেন মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। বর্তমানকালে প্রায় প্রত্যেকেই এই মতটি মেনে নিয়েছেন। সুতরাং বলা যায় নব্য ভারতীয় আর্যভাষান্তরে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কথ্যরূপ বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় প্রথম স্তরে মাগধীগোষ্ঠীর (মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের) কথ্যভাষাগুলি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়---পশ্চিমা শাখা ও পূর্বী শাখা । পূর্বী শাখার কথ্য ভাষা থেকে আবার দুটি উপভাষার জন্ম হয় ওড়িয়া এবং বঙ্গ-অসমিয়া। বঙ্গ-অসমিয়া শাখা আবার পরবর্তীতে বিভক্ত হয়ে দুটি ভাষার জন্ম দেয়

বাংলা ও অসমিয়া। আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় বাংলা ভাষা জন্মলাভ করে। জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিকাশকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে --- প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা ও আধুনিক বাংলা। প্রাচীন বাংলার সময়সীমা (আনুমানিক ৯৫০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ), মধ্য বাংলার সময়সীমা (আনুমানিক ১৩৫০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) এবং আধুনিক বাংলার সময়সীমা (১৭৬০—আজ পর্যন্ত)। এই বিকাশ পর্বে বাংলা ভাষায় প্রতি স্তরে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নানা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরের এককে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ছকের সাহায্যে বাংলা ভাষার উদ্ভবের এই ইতিহাসকে নির্দেশিত করলে দাঁড়ায় এরকম :

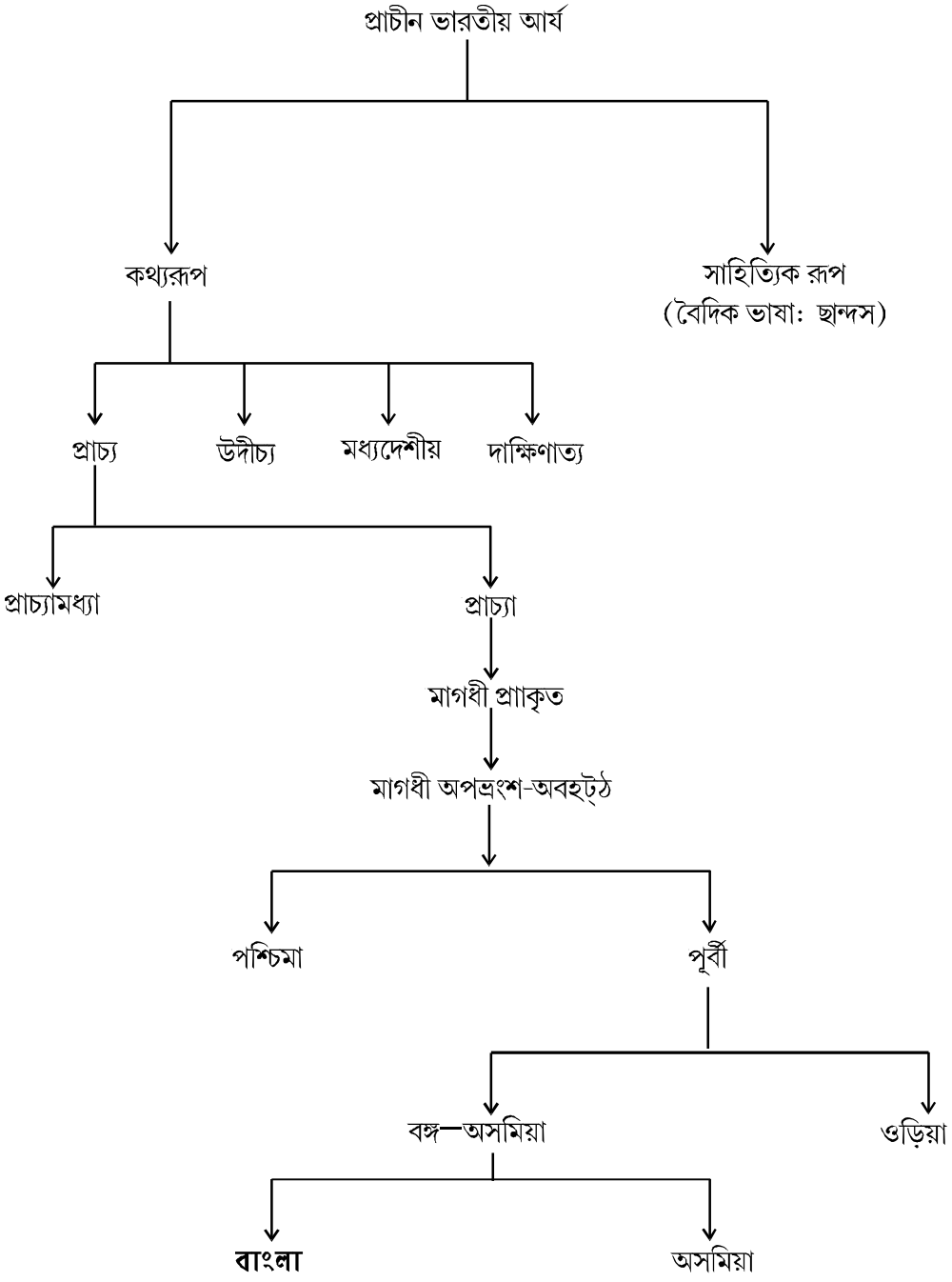

৩০১.২.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা ভাষা উদ্ভবের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করো।

২। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যেভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে নব্য ভারতীয় আর্য হিসেবে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে সংক্ষেপে সেই ইতিহাসের পরিচয় দাও।

৩০১.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা -- ড: রামেশ্বর শ পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯০, পৃষ্ঠা--৫৪৬।

২। ভাষাবিজ্ঞান পরিচয় -- ড: শ্রীকুমার বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা--১১৪।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা -- ড: রামেশ্বর শ, পৃষ্ঠা--৫৫৩।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৭

অসমিয়া ওড়িয়ার সহদরা হিসাবে বাংলা ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.২.৭.১ : ভূমিকা

৩০১.২.৭.২ : প্রাচীন বাংলা

৩০১.২.৭.৩ : মধ্য বাংলা

৩০১.২.৭.৪ : আধুনিক বাংলা

৩০১.২.৭.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৭.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.২.৭.১ : ভূমিকা

পৃথিবীর সমস্ত ভাষাবংশের মধ্যে অন্যতম হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ। শুধু ভৌগোলিক বিস্তারেই নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও এই ভাষাবংশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। বৈদিক সংহিতার সূক্তগুলি, ব্যাস-বাল্মীকির রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি, হোমারের ইলিয়াদ-অদিসি ইত্যাদি ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি। তা ছাড়া আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয় তো আছেই। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে, এই ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষা কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তনের ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে। জানা গেছে, মূল আর্য ভাষাভাষী মানুষ আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দশটি ভাষাবংশের সৃষ্টি হয়। দশটি শাখার অন্যতম হল ইন্দো-ইরানীয়। তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ইরানীয় আর্য, দরদীয় ও ভারতীয় আর্য ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি রূপ

প্রচলিত ছিল - কথ্যরূপ ও সাহিত্যিক রূপ। বেদ লেখা হয়েছিল সাহিত্যিক ভাষায়। আর কথ্য রূপের ছিল চারটি আঞ্চলিক উপভাষা। প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য। এই কথ্য উপভাষাগুলি লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই সূচনা ঘটল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার। প্রাচ্য থেকে প্রাচ্যা প্রাকৃত ও প্রাচ্য-মধ্যা প্রাকৃতের জন্ম হল। তারপর প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে প্রাচ্যা থেকে মাগধী সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হল। প্রাকৃতের বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে জন্ম হল অপভ্রংশের এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে পাওয়া গেল অবহট্‌ঠ। এর পরে ভারতীয় আর্য ভাষা তৃতীয় যুগে (আ: ৯০০ খ্রী:) পদার্পণ করে। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে পাওয়া গেল দুটি শাখা পশ্চিমা ও পূর্বী। তারপর পূর্বী শাখা থেকে জন্ম হল 'বঙ্গ-অসমিয়া' ও 'ওড়িয়া' ভাষার। অবশেষে বঙ্গ-অসমিয়া থেকেই সৃষ্টি হল বাংলা ভাষা।

পৃথিবীর সমস্ত ভাষাবংশের মধ্যে অন্যতম হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ। ভৌগলিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতেও এই ভাষাবংশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলা ভাষার গর্ব এই যে, এই ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই একটি ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দশটি ভাষাবংশের সৃষ্টি হয়। অবশেষে বঙ্গ অসমীয়া থেকেই সৃষ্টি হল বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষার জন্ম চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল :

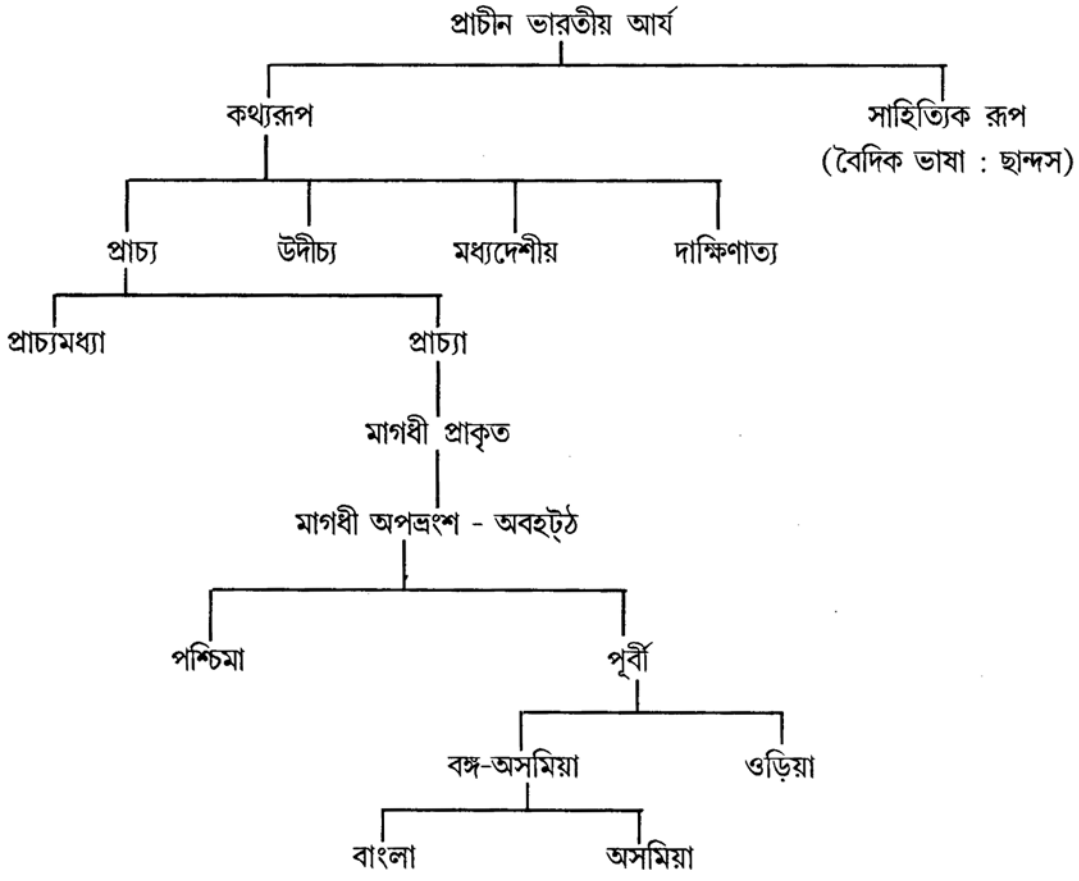

মাগধী প্রাকৃত বা মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই ড. পরেশ চন্দ্র মজুমদার সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে, বাংলা ভাষা আদর্শ কথ্য প্রাকৃত থেকে সৃষ্টি। কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রীয়ার্সন প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ বলেছেন যে, মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকেই বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই মতটিই অধিক প্রচলিত। আনুমানিক ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার জন্ম।

জন্মকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাভাষার বিকাশকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) প্রাচীন বাংলা ভাষা (Old Bengali = OB)

(২) মধ্য বাংলা (Middle Bengali = MB)

(৩) আধুনিক বাংলা (New Bengali = NB)

প্রশ্ন :

১। বাংলা ভাষা কোন ভাষা বংশেরই একটি ভাষা ?

২। অবশেষে বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে সৃষ্টি হয় ?

৩০১.২.৭.২ : প্রাচীন বাংলা

এই পর্বের সময়সীমা আনু: ৯৫০-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ। তুর্কি আক্রমণের সময় থেকে (১২০২ খ্রি:) পরবর্তী নিদর্শনহীন অংশকে ধরা হয় না। ৯৫০-১২০০ খ্রি: পর্যন্ত ধরা হয়। এই পর্বে প্রাপ্ত নিদর্শন - 'চর্যাপদে', সর্বানন্দ রচিত 'অমরকোষের' টীকায় চার শতাধিক বাংলা প্রতিশব্দে, ধর্মদাসের 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডলে', 'শেকশুভদয়ার' গানে-ছড়ায়।

বৈশিষ্ট্য :

(১) পদান্তিক স্বরধ্বনির স্থিতি - ভণতি > ভণই

(২) ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন - ধর্ম > ধম্ম > ধাম

(৩) বিভক্তির স্থানে অনুসর্গের ব্যবহার - তোহোর অন্তরে = তোর তরে।

(৪) -এর/-অর/-র' বিভক্তি যোগে সম্বন্ধ পদ - **রুখের** তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।

৩০১.২.৭.৩ : মধ্য বাংলা

সময়সীমা — ১৩৫০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ। এর নিদর্শন মেলে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, শাক্তসাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদিতে।

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) আ-কারের পরবর্তী 'ই/উ' ধ্বনির ক্ষীণতা - বড়াঞি > বড়াই।

(২) সর্বনামের বহুবচনে কর্তৃকারকে 'রা' বিভক্তি - আহ্মারা > আমরা

(৩) অপিনিহিতির ব্যবহার - করিয়া > কইরা

(৪) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল - 'র, এর' ইত্যাদি। যথা, '**রূপের** পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল'।

৩০১.২.৭.৪ : আধুনিক বাংলা

সময়কাল ১৭৬০ থেকে বর্তমানকাল। মানুষের মুখের ভাষাই এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তা ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ থেকে আধুনিক যুগের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসু প্রমুখের বিশাল রচনা সম্ভার এই ভাষার নিদর্শন। এর পাঁচটি উপভাষা রয়েছে — রাঢ়ী, বঙ্গালী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী। উল্লেখ্য ভাগীরথী তীরবর্তী বসবাসকারী মানুষের 'রাঢ়ী' উপভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে 'আদর্শ কথ্য বাংলা' (Standard Colloquial Bengali).

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) ব্যাপকভাবে 'অভিশ্রুতি' প্রক্রিয়ার ব্যবহার, যেমন — করিয়া > কইর‍্যা > করে

(২) স্বরসঙ্গতি লক্ষণীয় - দেশী > দিশি

(৩) বহুপদী ক্রিয়ারূপ দেখা যায় - গান করা, খেলা করা

(৪) ইংরেজি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি বহু বিদেশি শব্দের ব্যবহার - চেয়ার, টেবিল, আলপিন, হাকিম, কুপন ইত্যাদি।

(৫) নতুন নতুন ছন্দোরীতি এবং গদ্যছন্দের ব্যবহার সম্প্রতি ঘটেছে।

৩০১.২.৭.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ভাষা কাকে বলে ?

২। সুকুমার সেন ভাষা সম্পর্কে কি বলেছেন ?

৩০১.২.৭.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে'

একক - ৮

কলকাতা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.২.৮.১ : ভূমিকা

৩০১.২.৮.২ : কলকাতার ভাষা

৩০১.২.৮.৩ : নদিয়ার ভাষা

৩০১.২.৮.৪ : মুর্শিদাবাদের ভাষা

৩০১.২.৮.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.২.৮.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.২.৮.১ : ভূমিকা

আদর্শ চলিত বাংলা ভাষাই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাষা শিষ্ট বাঙালিদের মার্জিত ভাষা। সহজতা, সরলতা, প্রাঞ্জলতা যেমন এই ভাষার একটি বড় গুণ, তেমনই রসমাধুর্য ও ভাবগাম্ভীর্যেও সাবলীল এই ভাষা। এই ভাষা পাঁচটি উপভাষায় বিভাজিত। সেগুলি মূলত পশ্চিমবঙ্গ ও তার আশেপাশের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃত। সাধারণভাবে মনে হতে পারে বাংলা ভাষা বোধ হয় এই সব উপভাষাতেই সীমায়িত। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের যতগুলি জেলা আছে সব জেলার ভাষাতেই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। মূলত ধ্বনি, রূপ, বাক্যগঠন ও উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য ভাষাগুলিকে আলাদা করেছে। তা ছাড়াও পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি কারণে একটি জেলার ভাষার সঙ্গে অন্য জেলার ভাষার তফাৎ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওই সব ভাষা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হলেও আসলে তা বাংলা ভাষারই বিভিন্ন রূপ।

মানুষের কথাবার্তা বা সাহিত্য রচনার প্রবণতা দেখে বিভিন্ন জেলার ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায়। প্রাথমিকভাবে গঙ্গা তীরবর্তী কয়েকটি জেলার ভাষা-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে। সেগুলি কলকাতা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের লোকভাষা।

৩০১.২.৮.২ : কলকাতার ভাষা

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। একদা এটি ভারতেরও রাজধানী ছিল। কলকাতাকে। বলা হয় ভারতের সংস্কৃতি নগরী। আর সেই সংস্কৃতি মূলত বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে আছে। কলকাতা থেকে যত

গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার সিংহভাগই বাংলা ভাষায়। কলকাতার মানুষের ভাষা শিষ্ট, রুচিশীল, মার্জিত, অভিজাত। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কলকাতার মানুষেরও নিজস্ব একটা ভাষা আছে। যা আদর্শ চলিত বাংলা থেকে অনেকটাই আলাদা। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর প্রমুখ এ কথা স্বীকার করেছেন। অনেকে এই ভাষার একটা নতুন নামকরণও করেছেন। যেমন—বাবু কালচারের কথা ভেবে কালীপ্রসন্ন বলেছেন 'হুতোমি ভাষা"। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন "খাস কলকাত্তাই বুলি"। পবিত্র সরকারের মতে এটি "কলকাত্তাই বুলি"। আমরা বলতে পারি 'কলকাতার উপভাষা'। ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য :

১. কলকাতার বুলিতে "ই" ও "উ" স্বরধ্বনি "এ" বা "ও" তে পরিণত হয়েছে। যেমন—

উপর > ওপর (উ > ও)

ছিল > ছেল (ই > এ) ইত্যাদি

২. শব্দের আদিতে "আ" থাকলে, তা "অ্যা" রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—

ঝাঁটা > ক্যাটা

গাঁদাফুল > গ্যাঁদাফুল প্রভৃতি

৩. শব্দের অন্তে "য" ফলা থাকলে তা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হিসাবে প্রকাশ পায়। উদাহরণ—

বাদ্য > বান্দ

ভাগ্য > ভাগ্ন ইত্যাদি

তবে এ ক্ষেত্রে "য" ফলা "ই" কারে পরিণত হয়। যেমন—

যোগ্য > যোগি

নৈবেদ্য > নৈবেদি ইত্যাদি

৪. স্বরধ্বনির ওঠানামা কলকাতার বুলিতে দেখা যায়। যেমন শব্দে নাসিক্য ব্যঞ্জনথাকলে আগের স্বরধ্বনির উপর গতি দেখা যায়। যেমন—

সময় > সুময়

ব্রাহ্মণ > বামুন প্রভৃতি

আর স্বরধ্বনি নেমে যাচ্ছে এই উদাহরণগুলিতে যেমন

শোভাবাজার > "স" বাজার

সুন্দর > সোন্দর

পুকুর > পকুর ইত্যাদি

৫. "ঙ্ক" ও "ই" স্বরধ্বনির মধ্যে অবস্থিত "আ" এবং "অ" পরিণত হয়েছে "উ" তে।

ফুলরি > ফুলুরি

চিরনি > চিরুনি প্রভৃতি

৬. শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ায় মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা এই ভাষায় লক্ষণীয়। উদাহরণ— দেখছেন > দেকচেন

জ্যাঠা > জ্যাটা

কিনছে > কিনচে ইত্যাদি

৭. কলকাতার বুলিতে স্বর ও ব্যঞ্জনের লোপ দেখা যায়। যেমন

স্বরলোপ: বিয়ে > বে

ব্যঞ্জনলোপ : মরল > মলো ইত্যাদি।

৮. "ন" ও "ল"-এর মধ্যে বিপর্যাস এই বুলিতে দেখা যায়। যেমন

লোহা > নোয়া

লাল > নাল

ল্যাঠা > ন্যাটা প্রভৃতি

৯. সমীভবন প্রক্রিয়া এই ভাষায় দেখা যায়। বিশেষ করে 'র' যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেসমীভবন প্রক্রিয়াটি বেশি দেখা যায়। উদাহরণ

দুর্গা > দু>া

পারলে > পাল্লে

করছে > কচ্ছে

করতে > কত্তে

ধর্ম > ধর্ম ইত্যাদি

১০. শব্দমধ্যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের বিশিষ্টতা কলকাতার বুলিতে দেখা যায়। উদাহরণ—

প্রতিমা > প্রতিমে

মাঝিরা > মাজিরে প্রভৃতি

১১. স্বরভক্তির প্রবণতা এখানে দেখা যায়। যেমন

মিত্র > মিত্তির পুত্র > পুত্তির

ভদ্র > ভদ্দর ইত্যাদি

১২. স্বরের অনুনাসিকতা এখানে দেখা যায়। উদাহরণ—

হিন্দু > হিঁদু

হাসি > হাঁসি প্রভৃতি

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ায় ক্রিয়ার মধ্যবর্তী "এ" ধ্বনি "ই"তে পরিণত হয়। উদাহরণ—

বলেছে > বলিচি

এসেছি > এইচি ইত্যাদি

২. ক্রিয়া নিষেধের ক্ষেত্রে "না" শব্দটি "নে" বা "নি" উচ্চারিত হয়। যেমন—

বলতে পারিস না > বলতে পারিসনে অফিস যাস না > অফিস যাসনি প্রভৃতি

৩. সাধিত ক্রিয়ায় ধাতুতে "ই" ও "উ" এর পরবর্তী "আ" তে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ—

ঘুমাতে > ঘুমুতে

ছিটাচ্ছে > ছিটুচ্ছে ইত্যাদি

এ ছাড়া সাধিত ক্রিয়ায় বিকল্প ধাতুরূপও দেখা যায়। উদাহরণ—

মেশাচ্ছে > মিশোচ্ছে

পথটি পেছল > পথটি পিছোল প্রভৃতি

৪. কলকাতার বুলিতে দেখা যায় নিম্নবর্ণের ভাষায় "লুম" হয়েছে "নু"। যেমন—

করলুম > করনু

খেলুম > খেনু ইত্যাদি

৫. এই ভাষায় অতীত কালের প্রথম পুরুষের সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি "এ" এবং অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি 'ও'। যেমন

সে করলে।

সে গেলো ইত্যাদি।

৬. অতীত কালে উত্তম পুরুষে "উম" এবং "এম" বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ—

আমি করতুম।

আমি দেখলুম ইত্যাদি।

৭. কলকাতায় বুলিতে আরবি ও ফারসির মিশ্রণজাত বহু শব্দ দেখা যায় যেগুলি বর্তমানে লুপ্ত। যেমন—

"মোন্দা" (মোটের ওপর)

ঘ্যাম (অহংকার)

পগগ (পাগড়ি)

কুটিওয়ালা (অফিসের বাবু) ইত্যাদি।

৩০১.২.৮.৩ : নদিয়ার ভাষা

রাঢি উপভাষাকে কেন্দ্র করেই নদিয়া জেলার ভাষা গড়ে উঠেছে। এই উপভাষারই আদর্শ চলিত রূপটিই সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে নদিয়ার ভাষায় বঙ্গালীর মিশ্রণও দেখা গেছে। এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য।

১. অপিনিহিতির ব্যবহার নদিয়ার ভাষায় নেই বললেই চলে। যেমন—

করিয়া > কইর‍্যা > করে

২. অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

অভিশ্রুতি : ধরিয়া > ধইরা > ধরে

বলিয়া > বইল্যা > বলে ইত্যাদি

স্বরসঙ্গতি : নিরামিষ > নিরানিধি

দেশি > দিশি

বিলাতি > বিলিতি ইত্যাদি

৩. নদিয়ার উপভাষায় নাসিক্যীভবন ও স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—

নাসিক্যীভবন : ইষ্টক > ইট > ইট

স্বতোনাসিক্যীভবন : হাসপাতাল > হাঁসপাতাল ইত্যাদি

৪. পদের মধ্যে অবস্থিত "হ" কারের লোপ নদিয়ার ভাষায় দেখা যায়। উদাহরণ—

যাহার > যার

কাহার > কার প্রভৃতি

৫. নদিয়ার ভাষায় শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে।

দুধ > দুদ

আখ > আক ইত্যাদি

৬. মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পপ্রাণ বর্ণে বা অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হওয়ার প্রবণতা নদিয়ার উপভাষায় দেখা যায়। উদাহরণ—

মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণে পরিবর্তিত : মাছ > মাচ

বাঘ > বাগ ইত্যাদি

অঘোষ ঘোষে পরিবর্তিত: ছাদ > ছাত

উপকার > উরগার প্রভৃতি

৭. 'অ" কারের 'ও" কার উচ্চারণ প্রবণতা এবং "এ" ধ্বনির "অ্যা" উচ্চারণ প্রবণতা নদিয়ার ভাষায় দেখা যায়। উদাহরণ—

পাগল > পাগোল (অ > ও)

দেখ > দ্যাখ (এ > অ্যা) ইত্যাদি

৮. নদিয়ার উপভাষায় 'ও' 'উ' ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—

বোন > বুন ইত্যাদি

৯. নদিয়ার ভাষায় সমীভবন প্রক্রিয়াটি দেখা যায়। উদাহরণ—

পদ্ম > পদ

করছি > কচ্চি প্রভৃতি

১০. দুটি স্বরের মাঝে অবস্থিত "ম" ধ্বনি লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিককরে। যেমন—

বামুন > বাউন ইত্যাদি

১১. নদিয়ার কথ্য ভাষায় বিশেষ কতগুলি শব্দ বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

দাদাগিরি (মাতব্বরি করা)

খিলেন মাল (সহজ পাত্র নয়)

ঢপবাজ (ধোঁকা দেয় যে)

ঢ্যামনা (অকেজো)

ক্যাচাল (ঝামেলা করা)

বাচাল (বেশি কথা বলা) প্রভৃতি

১২. বর্ণবিপর্যয় নদিয়ার ভাষায় দেখা যায়। যেমন—

ট্যাক্সি > ট্যাকি

রিক্সা > রিস্কা ইত্যাদি

রূপগত বৈশিষ্ট্য :

১. নদিয়ার ভাষায় গৌণকর্মে "কে" বিভক্তি হলে মুখ্য কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয় না। উদাহরণ—

তুমি মাকে রান্না করতে বলেছো।

২. নিমিত্ত বা সম্প্রদান কারকেও "কে" বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।

৩. কর্তৃকারকের বহুবচনে গুলি ও তির্যক কারকের বহুবচনে "দের" বিভক্তি যুক্ত হয় এই ভাষায়। উদাহরণ — পাখিগুলি, মেয়েদের, ছেলেগুলি ইত্যাদি।

৪. নদিয়ার ভাষায় সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় "এ" বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—

পাখিতে ফল খায়।

বাঘে তাড়া করে।

৫. ঘটমান বর্তমানের ক্ষেত্রে নদিয়ার ভাষায় "ইচ্ছে" বা "চ্ছ" যুক্ত হয়। যেমন—

বেরোচ্ছে > বেরুচ্ছে ইত্যাদি।

৬. নদিয়ার ভাষায় ভবিষ্যৎ কালের ক্ষেত্রে "ইব" বিভক্তি যুক্ত হয়। উত্তম পুরুষেরক্ষেত্রে। যেমন—

আমি যাব > যাবো

আমি দেব > দেবো প্রভৃতি

৭. নদিয়ায় ব্যবহৃত মিশ্র ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ রাঢ়ীর থেকে আলাদা। যেমন—

করিতে লাগিল (মূলভাষা)> করতে লাগল (রাঢ়ী) > কইতে নাইগলো (নদিয়ার মিশ্র ভাষা)

৮. অব্যয় ব্যবহারেও বিশেষত্ব নদিয়ার মিশ্র ভাষায় দেখা যায়। উদাহরণ—

তাহলে > তাইলে > তাইলি

নাহলে > নাইলে > নাহলি ইত্যাদি

৯. বিশেষণ ব্যবহারে উচ্চারণগত তারতম্য নদিয়ার ভাষায় মিশ্রণজাত প্রভাবেরফলে হয়েছে। যেমন—

ভাল > ভালো > বাল

সত্য > সত্যো > সত্যি প্রভৃতি

১০. নদিয়ার ভাষায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহারেও বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—

ক. ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের সময় "স" ধ্বনি "ছ" ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

যেমন—

সাইক্লোন > ছাইকোন

সুপার > ছুপার ইত্যাদি

খ. ইংরেজি শব্দে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ—

বাসস্ট্যান্ড > বাসট্যান্ড প্রভৃতি।

১১. বাক্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যবহৃত ভাষায় জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যেরক্ষেত্রে 'কে', 'কিডা' ইত্যাদির ব্যবহার। যেমন—

ওখানে কে রে?

কিডা যাবি স্কুলে ?

এ ছাড়া সম্বোধনসূচক বাক্যের শেষে লো, গে, গো, গা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তুমি কি বোইলচ গো।

সখি কি আসলে গো।

বউ কি জল আনলে গা।

১২. ক্রিয়ার ব্যবহারে নতুনত্ব দেখা যায় নদিয়ার ভাষায়। যেমন—

নিয়ে এস > নিই আনো ইত্যাদি।

৩০১.২.৮.৪ : মুর্শিদাবাদের ভাষা

মুর্শিদাবাদের কথ্য বাংলা মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা ফরাক্কা সমসেরগঞ্জ-সুতি থানা-বিহারের সীমান্ত অঞ্চল, রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর-সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত অঞ্চল, বড়োঞা, খড়গ্রাম, ভরতপুর ও কান্দির উপভাষা অঞ্চল। এই তিনটি অঞ্চলের ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটিভাবে মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষার সর্বজনীন লক্ষণগুলি বোঝা যাবে। যেমন ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য:

১. এই ভাষায় হিন্দি ও উর্দুর প্রভাব আছে। যেমন—

আমি > হামি

আমাকের > হামাকের ইত্যাদি

২. এখানকার ভাষায় "হ" এর উচ্চারণ স্পষ্ট নয়।

৩. স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রবণতা এই উপভাষায় দেখা যায়। উদাহরণ—

হাসপাতাল > হাঁসপাতাল

শসা > শসা ইত্যাদি

৪. এই অঞ্চলের ভাষায় শব্দের অক্ষর বিশেষে জোর পড়ে, কথায় টান ও সুরেররেশ থাকে।

তুই যাবি > তুই যা...ব... ই

৫. এই ভাষার শব্দে "উ" এর আগম হয়। যেমন—

বোনাই > বুনাই

বোন > বুন ইত্যাদি

৬. স্বরসঙ্গতির প্রভাব এই ভাষায় দেখা যায়।

যেমন বিলাতি > বিলিতি

দেশি > দিশি প্রভৃতি

৭. "ন" ও "ল"-এর মধ্যে বিপর্যাস এই ভাষায় দেখা যায়। উদাহরণ—

নিয়ে > লিয়ে

কড়ার > কড়াল ইত্যাদি

৮. "এ" কারের "অ্যা" উচ্চারণ প্রবণতা মুর্শিদাবাদের ভাষায় দেখা যায়। যেমন—

দেন > দ্যান

দেশ > দ্যাশ প্রভৃতি

৯. সম্বোধনবোধক শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের শেষে "আ" যুক্ত হয়। যেমন—

দেওর > দেওরা

শ্বশুর > সসুরা ইত্যাদি

১০. এই ভাষায় পদান্তের যুক্ত ব্যঞ্জনে স্বর লুপ্ত হয়। উদাহরণ—

গৃহস্থ > গিরস্ত ইত্যাদি

১১. এই উপভাষায় অস্ট্রিক প্রভাব ছাড়াও বীরভূম, বর্ধমানের রাড়ী উপভাষারপ্রভাব আছে।

১২. "র" (তরলধ্বনি) ও "ড়" (তাড়িত) এর মধ্যে কোনও পার্থক্য এই ভাষায়দেখা যায় না। যেমন—

বর > বড়

মরা > মড়া

সরা > সড়া প্রভৃতি

১৩. 'স' 'শ' এই উপভাষায় "ছ" উচ্চারিত হয়। যেমন—

শুন > ছুন

মহাশয় > মহাছয় ইত্যাদি

১৪. "ট" এই অঞ্চলের ভাষায় "ড" রূপে উচ্চারিত হয়। উদাহরণ—

এটা > এডা

সেটা > সেডা প্রভৃতি।

রূপগত বৈশিষ্ট্য:

১. মুর্শিদাবাদের রাঢ় ভূ-খণ্ডের ভাষার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত "অ" এবং "ও" "উ"-কারে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ—

পোষ > পুষ

বলছি > বুলছি

বল > বুল প্রভৃতি

২. এই উপভাষায় 'বট" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন—

কুথা যাবি বটে।

বুলবি বটে।

৩. এখানকার উপভাষায় "গম ধাতু সকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ—

এখানকে এস।

ঘরকে যাও।

৪. "আচ্ছা" শব্দের পরিবর্তে এই উপভাষায় "হোক" শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

আস্তার ঘর যেও হোক।

৫. ইয়া অন্ত্যাক অসমাপিকা ক্রিয়ায় "হ" যুক্ত হয় এই উপভাষায়। যেমন—

করিয়া > করিং

ডুবিয়া > ডুবিং

বলিয়া > বলিং ইত্যাদি

৬. শব্দদ্বৈতের বিপর্যয় মুর্শিদাবাদের রাঢ়ী উপভাষায় দেখা যায়। যেমন—

মারামরি > মারিমারা

গালাগালি > গালিগালা প্রভৃতি

৭. মুর্শিদাবাদের বাগড়ির উপভাষায় ক্রিয়াপদে "ল" ও "র"-এর আগম ঘটে। উদাহরণ—

গিয়েছিল গেলছিলো

খেয়েছিল > খেলছিলো ইত্যাদি

৮. ক্রিয়ার অন্তে অবস্থিত "ছ" যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে থেকে "চ" লোপ পেয়ে যায়। যেমন—

যাচ্ছো > যাচ্ছো

খাচ্ছো > খাচ্ছো প্রভৃতি

৯. ক্রিয়াপদের নেতিবাচক বাক্যে "ত্বক", "তুকনা" ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

যেতাম > যেতুক না প্রভৃতি

১০. মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষায় দুটি বিশেষণের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

"কঠিন" শব্দটি বহুল অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ—

কঠিন দাম (অনেক দামি)

কঠিন মিষ্টি (তীব্র)

কঠিন গরম (প্রচণ্ড গরম) ইত্যাদি

১১. মুর্শিদাবাদের কান্দি, গণকারের পটুভাষায় মূল্যবোধ যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন—

খাওয়া > সেবা

১২. এই ভাষায় কিছু নতুন শব্দ বিশিষ্ট বিশেষ্য পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ—

ঝোল > প্রভৃতি

লঙ্কা > আঙ্গুর

সিদ্ধারা > সিঙ্গারা ইত্যাদি

১৩. মুর্শিদাবাদের হাটে বাজারে ব্যবসাদারদের "দালালী বুলি"-তে পরিমাপ, গণনাও দামের বিশিষ্ট পরিভাষা লক্ষ করা যায়। যেমন—

এক > মিত বা মির

দশ > তালা

১০০০ > তালাশ

৮০০০ > বসুহাজার

১৬ > লসু প্রভৃতি

৩০১.২.৮.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) কলকাতার ভাষার স্বরূপ আলোচনা করে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২) নদিয়ার ভাষার স্বরূপ আলোচনা করে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৩) মুর্শিদাবাদের ভাষার স্বরূপ আলোচনা করে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৩০১.২.৮.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

২। রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৩। পবিত্র সরকার : ভাষা দেশ-কাল

৪। পবিত্র সরকার : বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ

৫। সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

৬। সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ৯

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (ঐতিহাসিক প্রাগৈতিহাসিক পর্ব)

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৩.৯.১ : ভাষাচর্চার পূর্বধারা

৩০১.৩.৯.২ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistics)

৩০১.৩.৯.৩ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি কী

৩০১.৩.৯.৪ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ

৩০১.৩.৯.৫ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পর্ব, পদ্ধতি ও উপযোগিতা

৩০১.৩.৯.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.৯.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.৩.৯.১ : ভাষাচর্চার পূর্বধারা

প্রাচীনকালে ভাষাচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল গ্রিস ও ভারতে। শুধুমাত্র সূত্রপাত-ই নয়, এই দুই প্রাচীন সভ্যতায় জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো এই ক্ষেত্রেও চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। প্লেটো (৪২৭-৩৪৮ খ্রি: পূ:) তাঁর গ্রন্থে 'ডাইঅ্যালগ্স্' (Dialogues) এর 'ক্রাতুলোস' (Kratulos) অধ্যায়ে শব্দের উৎস নিয়ে আলোচনা করে ভাষাচর্চার পথ খুলে দেন। তাঁর পরে তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল (খ্রি: পূ: ৩৮৪-৩২২) কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'পোয়েটিক্স্' (poetics)-এর তিনটি অধ্যায়ে ভাষাকে পর্যায়ক্রমে Letter, Syllable, Conjunction, Article, Noun, Verb, Case ও Speech—এই অংশসমূহ বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু প্লেটো বা অ্যারিস্টটল—কেউই ভাষাচর্চাকে জ্ঞানচর্চার একটি পৃথক শাখা রূপে বিবেচনা করেননি। পরবর্তীকালে এথেন্সের স্টোইক (stoic) দর্শনগোষ্ঠীর সদস্যরা দর্শনশাস্ত্রেরই অন্তর্গত একটি পৃথক জ্ঞানচর্চার শাখা রূপে ভাষাচর্চকে বিবেচনা করেন। ভাষাচর্চা করতে গিয়ে তাঁরা ধ্বনি, শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপ এবং শব্দের বুৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের হাতে গ্রিকভাষার কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হয়। এই ব্যাকরণ রচয়িতাদের মধ্যে দিওনুসিওস থ্রাক্স (খ্রি: পূ: ২য় শতক), আপোলোনিওস্ দুস্কোলাস্ (খ্রি: ২য় শতক) ও তাঁর পুত্র হেরোদিয়ানুস উল্লেখযোগ্য। থ্রাক্স রূপতত্ত্বের,

আপোলোনিওস্ বাক্যতত্ত্বের এবং হেরোদুয়ানুস স্বরাঘাত ও অবিভাজ্যধ্বনি সম্পর্কে প্রথম বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন।

গ্রিক বৈয়াকরণদের হাতে গ্রিক ব্যাকরণের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে উঠেছিল সেই কাঠামো অনুসরণ করে রোমানরা লাতিন ভাষার চর্চা ও ব্যাকরণ রচনা করতে থাকেন। ভারো (খ্রি: পূ: ১ম শতাব্দী), কুইন্তিলিয়ানুস (খ্রি: ১ম শতাব্দী), দোনাতুস (খ্রি: ৪র্থ শতাব্দী), প্রিস্কিয়ানুস (খ্রি: ষষ্ঠ শতাব্দী) প্রমুখ রোমানের হাতে লাতিন ব্যাকরণেরও একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে উঠে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুটা বর্ণনামূলক রীতিতে রচিত প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণ 'ইন্সতিতুতিওনেস গ্রামাতিকা এ (Institutiones Gramaticae)। একসময় ব্যাকরণটি ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ হয়ে যায়। ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণ প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণের আদর্শেই রচিত। এই পর্বে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল, ইতালীয় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে ব্যাকরণ রচিত না হলে সে ব্যাকরণ অশুদ্ধ। এইভাবে বিধিবদ্ধ নিয়মে যে ব্যাকরণ চর্চা হচ্ছিল তা প্রকৃতপক্ষে নির্দেশমূলক ব্যাকরণ চর্চার ধারা। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই ধারা সমস্ত মধ্যযুগেই ব্যাকরণ চর্চার অবলম্বন ছিল। অর্থাৎ দেখা গেল, ইউরোপে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষাবিদ্যার যাত্রা শুরু হয়ে আংশিক বর্ণনামূলক ধারা অবলম্বন করে এক পর্বে তা নির্দেশমূলক ব্যাকরণ রচনার ধারায় পরিণতি পায়।

ভারতে ভাষা সংক্রান্ত ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক গ্রন্থগুলির (খ্রিঃ পূঃ ১৫০০-৬০০) 'সংহিতা'-র মধ্যেই। যদিও সেখানে বিস্তৃত আলোচনা নয়, ভাষা-সংক্রান্ত কিছু বিক্ষিপ্ত উক্তিমাত্র পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণ'-এ ধ্বনির উচ্চারণ, সন্ধি, পদ, বিভক্তি, বচন ও ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনাও দেখা যায়। ভাষা-সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ ধারাবাহিক আলোচনা শুরু হয় 'বেদাঙ্গ'-র মধ্যে। 'জ্যোতিষ' ও 'কল্প' ছাড়া অন্য চারটি 'বেদাঙ্গ'—শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দ মূলত ভাষার বিভিন্ন দিকের আলোচনা। 'শিক্ষা'-য় ধ্বনির প্রকৃতি, উচ্চারণ, স্বরাঘাত প্রভৃতি দিক আলোচিত হয়েছে। 'নিরুক্ত' শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় ও শব্দকোষ বিষয়ক গ্রন্থ। 'ছন্দ' ছন্দ-বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। 'ব্যাকরণ' মূলত ভাষার রূপতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। তবে পরে পরে ভাষার বিবিধ দিক এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতে প্রথম যে ব্যাকরণ গ্রন্থটি পাওয়া যায় সেটি পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী'। এই কারণে পাণিনিকেই আদিতম ব্যাকরণবিদ্ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু পাণিনি-ই তাঁর পূর্বে আবির্ভূত শৌণিক, কাশ্যপ, গার্গ্য, ভরদ্বাজ, গালব প্রমুখ ব্যাকরণবিদের নাম করে গিয়েছেন। যদিও তাঁদের কোনো ব্যাকরণ গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। পাণিনির আবির্ভাব কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশের মতে তিনি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণটি রচনা করেছিলেন। 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণটি সাতরকমের সর্বমোট চার হাজার সূত্র নিয়ে রচিত। ব্যাকরণটির রচনাপদ্ধতি অনেকখানি এককালিক-বর্ণনামূলক (Synchronic-descriptive)। কারণ তিনি ভাষার উদ্ভব বিবর্তন—এসব সম্পর্কে আলোচনা না করে সংস্কৃত ভাষার এককালেরই রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিককালে ভাষাবিজ্ঞানের বর্ণনামূলক ধারা এই রীতিরই সদৃশ। একালের বর্ণনামূলক ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী, লিওনার্দো ব্লুমফিল্ড পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন—"..... the grammar of Panine ....., is one of the greatest monuments of human intelligence". (Language).

পাণিনির পরবর্তীকালে পাণিনির ব্যাকরণের আবর্তের মধ্যেই ভারতের ভাষাচর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁর ব্যাকরণের সূত্রের, ভাষ্য, তস্য, ভাষ্য, তাঁর সূত্রের বিরোধিতা ও সমর্থন—এসবেই ব্যাকরণ, রচনার ধারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মৌলিক ভাবনার সাহায্যে নতুন ধরনের ব্যাকরণ প্রচেষ্টা ছিল না বললেই চলে। পাণিনির পরে কাত্যায়ন (আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) তাঁর 'বার্তিক'-এ পাণিনির দেড় হাজার সূত্রের বিরোধিতা করে নিজস্ব সূত্র দেন। কাত্যায়নের পরে পতঞ্জলি (খ্রি: পূ: তৃতীয় শতক) তাঁর 'মহাভাষ্য'—এ প্রাঞ্জল ভাষায় কাত্যায়নের সূত্রগুলি খণ্ডন করে পাণিনির সূত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পাণিনির ব্যাকরণের অন্য সূত্রেরও তিনি ভাষ্য দিয়েছেন। এর অনেক পরে আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয়, যার নাম 'বাক্যপদীয়'। এর রচয়িতা ভর্তৃহরি। এই ব্যাকরণটি পদ্যবন্ধে রচিত। ভর্তৃহরি এই ব্যাকরণে ভাষার রূপগত বিশ্লেষণ নয়, ভাষার দার্শনিকতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী ছিলেন। এরকম দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সমস্ত ব্যাকরণই পাণিনির আদর্শ অবলম্বনে রচিত। পাণিনির আশ্রয়ে এই যে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়, এর বাইরে ভারতে আরো কতকগুলি ভাষা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যেমন ঐন্দ্র সম্প্রদায়, চান্দ্র সম্প্রদায়, জৈনেন্দ্র সম্প্রদায়, শাকটায়ন সম্প্রদায়, হেমচন্দ্র সম্প্রদায়, কাতন্ত্র সম্প্রদায়, সারস্বত সম্প্রদায়, মুগ্ধবোধ সম্প্রদায়, নব্য ন্যায় সম্প্রদায় প্রভৃতি। মূলত প্রবক্তা বা প্রধান বৈয়াকরণের নামানুসারেই সম্প্রদায়গুলির নামকরণ হয়েছে। এইসব ভাষা সম্প্রদায় কখনো পাণিনির ব্যাকরণের জটিলতা বর্জন করে ব্যাকরণের মূল বিষয়গুলিকে সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য করে তুলেছে, কখনো পাণিনির ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য করে তুলেছে, কখনো পাণিনির ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত করেছে, কখনো কোনো সম্প্রদায় ভর্তৃহরির আদর্শকে গ্রহণ করেছে ইত্যাদি। অর্থাৎ মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু নাই বললেই চলে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ব্যাকরণচর্চার ধারায় শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষা নয়, পালি ও প্রাকৃত ভাষাকেও স্থান দেওয়া হয়েছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণগুলির মধ্যে বররুচির 'প্রাকৃত-প্রকাশ' (খ্রিঃ ৫ম শতক), লক্ষ্মীধর (১৬শ শতক)—এর 'ষড়ভাষা চন্দ্রিকা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালি ব্যাকরণগুলির মধ্যে কচ্চায়ন (খ্রিঃ ৮ম শতক)—এর ব্যাকরণ, মোগ্‌গল্লয়ান (১২শ শতক) এর ব্যাকরণ এবং অগ্‌গবংস (১২শ শতক) রচিত 'সদ্দনীতি' গুরুত্বপূর্ণ।

পাণিনি থেকে শুরু হয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতে ভাষাচর্চার এই যে ধারা, তা লক্ষ করলে দেখা যায়, ভারতে ভাষাচর্চা শুধু হয়েছিল বর্ণনামূলক পদ্ধতিতেই; কিন্তু পরবর্তীকালে কখনো কখনো তাতে দার্শনিক তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ভাষাচর্চা ইউরোপীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাষাচর্চার মতোই কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক হয়ে উঠেছিল।

৩০১.৩.৯.২ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistics)

ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনোও ভাষার উৎস, ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা নির্ণয় করা হয় তাকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বলে।

৩০১.৩.৯.৩ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি কী ?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভাষাবিদ্যা চর্চার যে পদ্ধতিগত ধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ধারার সূচনা হয় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির সাহায্যে। ভাষাবিজ্ঞান চর্চার যে পদ্ধতিতে কোনো ভাষার উৎস নির্ণয়, বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা ও সমগোত্রীয় ভাষাসমূহের প্রেক্ষিতে পরিবর্তনের লক্ষণ বিচার-বিশ্লেষণ করে সাধারণ সূত্রে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা থাকে তাকেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি বলে।

যেহেতু ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে একটি ভাষার প্রাচীনরূপ থেকে আধুনিক রূপ পর্যন্ত স্তরগুলির পর্যালোচনা করা হয় তাই অনেকে এটিকে কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান (Diachronic Linguistics)—এর সঙ্গে এক করে ফেলেন। কারণ, কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানেও একটি ভাষার স্তর-পরম্পরায় বিবর্তন লক্ষ করা হয়। কিন্তু এই দুটি পদ্ধতির কিছু পার্থক্য রয়েছে। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে ভাষাস্তরগুলির প্রতিটি পর্যালোচনায় এককালিক বর্ণনাকে (Synchronic description) অবলম্বন করা হয়, কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে তা হয় না। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি ও তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক (comparative philology) পদ্ধতির মধ্যেও পার্থক্য খুব কম। অনেক সময় তাই এদের একটি পদ্ধতি ধরে ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতিও বলা হয়। এই দুই পদ্ধতির ভাষাচর্চার মূল বিষয় প্রায় এক। দুটি পদ্ধতিতেই ভাষার মধ্যে রক্ষিত প্রাচীন উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, ভাষার মধ্যে তুলনাত্মক আলোচনা করা হয়। কিন্তু দুটি পদ্ধতিরও লক্ষ্য এক নয়। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালে কালে ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠন, পরিবর্তন—ধ্বনিগত, রূপগত, সংগঠনগত, অর্থগত ইত্যাদি সবদিকেই লক্ষ করা হয়। এমনকি তার সমাজপ্রেক্ষিত, লোকমনস্তত্ত্ব ইত্যাদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। একারণে সমাজভাষাবিজ্ঞান, মনোভাষাবিজ্ঞান সহ এককালিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার নানা ক্ষেত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এভাবেই ভাষার পরিবর্তনের কারণ বুঝতে চাওয়া হয়, ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং সাধারণ সূত্র উদঘাটন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অন্যধারে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে বিভিন্ন ভাষা বা ভাষার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তরের সাধারণ উপাদানগত বৈশিষ্ট্য তুলনা করে তারা কোনো ভাষা-পরিবারে আছে, তাদের ভাষাবংশ সাধারণ কী না—এসব খোঁজা হয়। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব রীতি অনুসৃত হয়।

৩০১.৩.৯.৪ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অষ্টাদশ শতকে। আর বিকশিত হয়েছে সম্পূর্ণ উনিশ শতক জুড়ে। এ সময় ভাষাচর্চার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিকেই বোঝাত। এই পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক শুরুর ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতার ভূমিকা ছিল। সেই বক্তৃতাটি স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৬) ১৭৮৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি কলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর একটি সভায় প্রদান করেন। সংস্কৃত, লাতিন, গ্রিক ও জার্মান ভাষাগুলি সম্পর্কে সে বক্তৃতায় তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি ভাষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন—"সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন, এর সংগঠন বিস্ময়কর। এই ভাষা গ্রিকের চেয়ে উৎকৃষ্ট, ল্যাটিনের

চেয়ে ঐশ্বর্যময় এবং উভয় ভাষার চেয়েই সুচারু-পরিশীলিত। তবুও, এই ভাষা উভয় ভাষার সঙ্গেই ক্রিয়ামূল ও শব্দরূপে এক সুগভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত, যা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এদের মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় যে এই তিনটি ভাষা নিরীক্ষার সময় কোনো ভাষাবিজ্ঞানীই বিশ্বাস না করে পারবেন না যে এরা এক অভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত, যে উৎস হয়তো এখন বিলুপ্ত।" অবশ্য জোন্সের এই পর্যবেক্ষণের পূর্বেও কেউ কেউ সংস্কৃতের সঙ্গে কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন। যেমন, অনেক পূর্বে ষোড়শ শতকের শেষভাগে সাস্‌সেন্ডি সংস্কৃত ও ইতালীয় শব্দের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করেন। ১৭৬৭ সলে জেসুইট ধর্মযাজক কোরদো সংস্কৃত ও লাতিন শব্দসম্ভারের অনেক ঐক্য খুঁজে পান। এন. বি. হালহেড তাঁর 'এ গ্রামার অফ্ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' ("A grammar of the Bengal Language" (১৭৭৮)-এর ভূমিকায় লিখেছেন— "আমি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ফারসী ও আরবী এবং এমনকি লাতিন ও গ্রিক শব্দের সাদৃশ্য দেখে বিস্মৃত হয়েছি।" এইসব ক্রমিক পর্যবেক্ষণ এবং জোন্সের বিখ্যাত বক্তৃতার পর ইউরোপে তুলনামূলক ভাষা-গবেষণায় জোয়ার আসে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ভাষাবিদ ছিলেন জার্মান এবং সংস্কৃতজ্ঞ। তাঁরাই প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে জার্মানিক ভাষাবংশের ভাষাগুলির সম্পর্ক প্রদর্শন করেন। তাঁদের চর্চার পদ্ধতি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি। যেহেতু জার্মানিক ও ভারতীয় আর্য ভাষাবংশের ভাষাগুলিই এই গবেষণায় প্রধান অবলম্বল হয়ে উঠেছিল তাই আর্য ভাষাবংশের নাম-ই হয়ে যায় ইন্দো-জার্মানিক ভাষাবংশ। বর্তমানে এই ভাষা বংশটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ নামেই পরিচিত।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলনামূলকতা, তার আধুনিকরূপে ও মূলনীতি নির্মিত হয়েছিল ফ্রিডরিশ শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯) ও অ্যাডলফ শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচেষ্টায়। ফ্রিডরিশ-ই প্রথম 'তুলনামূলক ব্যাকরণ' (Comparative Grammar) কথাটি প্রয়োগ করেন। পরে এই কথাটি 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব'-কে অবলম্বন করেই ক্রমে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রণালি উদ্ভাবিত হয়। এই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিকে সুস্পষ্ট রূপ দান করেন রাসমুস রাস্ক (১৭৮৭-১৮৩২), ফ্রানৎজ বপ্ (১৭৯১-১৮৬৭), গ্রীম ভ্রাতৃত্বয়—য়্যাকব গ্রীম (১৯৭৫-১৮৬৩) ও ভিলহেল্‌ম গ্রীম (১৭৮৬-১৮৫৯) প্রমুখ। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করেন আউগুস্ট শ্লেইসার (১৮২৩-১৮৬৮), হেরমান গ্রাসমান (১৮০৯-১৮৭৭), কার্ল-ভার্নার (১৮৪৬-১৮৯৬) প্রমুখ। উনিশ শতকের শেষ পর্বে-ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব্য ব্যাকরণবিদরা (junggrammatiker)-রা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন কার্ল-ব্রুগম্যান (১৮৪৯-১৯১৯), হেরমান অশ্‌হ্‌টহফ (১৮৪৭-১৯০৯) প্রমুখ।

ঐতিহাসিক-তুলনামূলক পদ্ধতির এই সব ভাষাবিজ্ঞানীর—অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল জার্মান ভাষায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম ও বাংলায় অনুদিত নাম দেওয়া যায়। যেমন, ফ্রিডরিশ শ্লেগলের 'ভারতীয় ভাষা ও প্রজ্ঞা' (১৮০৮) [Uber die sparche und weisheit der. India], রাসমুস্ রাস্কের 'প্রাচীন নর্স বা আইসল্যান্ডীয় ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে অনুসন্ধান (১৮১৮), [Undersogelse om det gamle nordiske eller islandske sprogs oprindelse], ফ্রানৎজ্ বপ্-এর 'গ্রিক, লাতিন, ফারসি ও জার্মান

ভাষার ধাতুরূপ প্রণালীর সঙ্গে তুলনাসহ সংস্কৃত ভাষার ধাতুরূপ প্রণালী" (১৮১৬) [Uber das conjugation-system der sanskritsprache in vergleichung mit jenem der Griechischen, Lateinnischen, piersischen und Germanischen Sparche], য়্যাকব গ্রীমের জার্মানীয় ব্যাকরণ' (১৮১৯) (Deutsche grammatik], ব্রুগম্যান ও ডেলবুকের 'ইন্দো-জার্মান ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণের রূপরেখা (পাঁচখণ্ড, ১৮৮৬—১৯০০) [Grundress der Vergleichenden Grammatik der idg sprachen] প্রভৃতি। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি মাত্র এক শতকে এতখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে প্রাচীন ভাষার সংখ্যা ছিল বেশি। শুধুমাত্র তাই নয়, এই ভাষাগুলির উন্নত ব্যাকরণ ছিল। তাই ভাষাগবেষকদের যেমন উপাদানের অভাব ছিল না তেমনি ভাষাগুলির বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য জানার পথ উন্মোচিত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই পদ্ধতিতে অন্যান্য ভাষাবংশগুলির চর্চা এরকমভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেনি।

৩০১.৩.৯.৫ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পর্ব, পদ্ধতি ও উপযোগিতা

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে ভাষাচর্চার দুটি সুনির্দিষ্ট পর্ব আছে—প্রাগৈতিহাসিক পর্ব (Pre-historic period) ও ঐতিহাসিক পর্ব (Historic period)। ঐতিহাসিক পর্বের চর্চায় ইতিহাসের নানা উপাদান অর্থাৎ প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি প্রভৃতি প্রমাণাদির সাহায্য নেওয়া হয়। অর্থাৎ লিপিবদ্ধ দলিল (Written Records) থেকে ভাষার রূপ ও বিবর্তন বুঝে নেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়। ঐতিহাসিক পর্বের উপাদানগুলিকে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ (Internal evidence) ও বাহ্যিক প্রমাণ (External evidence)—এভাবে পৃথক করা যায়। লিপিবদ্ধ দলিলগুলিতে লিপির ব্যবহার-কৌশল, রৈখিক ও চিত্রাদি বিষয়, শব্দসম্ভার এবং ভাষাবৈশিষ্ট্য অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ। অপরদিকে ঐতিহাসিক লিখনগুলির বিষয়বস্তু, একই কালে বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত-প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বিভিন্ন লিপির ভাষাবৈচিত্র্য, বিভিন্ন কালে প্রাপ্ত লিপির ভাষাবৈচিত্র্য—এসব বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণ।

প্রাগৈতিহাসিক পর্বে যুক্তির সাহায্যে অনুমানকে ভিত্তি করে ভাষার অতীত রূপ গঠনের গবেষণা-প্রণালীকে অবলম্বন করা হয়। ভাষার পরিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করে যে সূত্র আবিষ্কৃত হয় সেই সূত্রের নির্ভরে ভাষার প্রাচীন রূপ গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক ভাষারূপ গঠনের পদ্ধতিকে পুনর্গঠন (Reconstruction) বলা হয়। যে ভাষারূপটি এর ফলে গড়ে উঠে তাকে পুনর্গঠিত রূপ (Reconstructed From) বলে। এই প্রাগৈতিহাসিক ভাষারূপ গঠন এবং ভাষাসমূহের মধ্যে বংশগত বা পারিবারিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য, শ্রেণীকরণের জন্যে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—

(১) আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internationl Reconstruction)

(২) বাহ্যপুনর্গঠন বা তুলনামূলক পদ্ধতি (External Reconstruction or comparative method)

(৩) উপভাষাগত ভূগোল (Dialect Geography) এবং

(৪) শব্দের অবক্ষয় ও নতুন শব্দ সৃষ্টি বিষয়ক পরিসংখ্যান (Glotto-chronology or Lexico-statistics)

এই পদ্ধতিগুলিকে ভাষাবিজ্ঞানী হকেট ভাষার ইতিহাসচর্চার পরোক্ষ পদ্ধতি (Indirect technique) বলেছেন।

'শব্দের অবক্ষয় ও নতুন শব্দ সৃষ্টি বিষয়ক পরিসংখ্যান'-এর সাহায্যে দুটি সম্পর্কিত ভাষার পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র হয়ে যাবার সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। সে ক্ষেত্রে সম্পর্কিত দুটি ভাষার মূল শব্দসম্ভার (basic-core vocabulary)—এর সাদৃশ্য বিচার করা হয়। কত শতাংশ শব্দ সদৃশ তা লক্ষ করে ভাষা দুটির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কাল অনুমান করা হয়। সাদৃশ্যে পরিমাণ যত বেশি হয় বিচ্ছিন্নতার কাল তত কম বলে ধরে নেওয়া হয়। 'উপভাষাগত ভূগোল' রীতিপদ্ধতিতে সামাজিক স্তরভেদে যে সামাজিক উপভাষা (Social Dialect) এবং অঞ্চলভেদে যে আঞ্চলিক উপভাষা (Regional Dialect) গড়ে ওঠে সেগুলির মধ্যে রক্ষিত বিভিন্ন প্রাচীন উপাদান, বিশেষ উচ্চারণ রীতি, বিশেষ শব্দ বা শব্দরূপ ইত্যাদি বিচার করে ভাষাবিস্তারের ইতিহাসের উপাদান সন্ধান করা হয়। পার্থক্য বেশি হলে, নিজস্ব সাহিত্যে সমৃদ্ধ হলে উপভাষাগুলি একসময় পৃথক পৃথক ভাষায় পরিণত হয়। 'উপভাষাগত ভূগোল' রীতি-পদ্ধতিতে কোন্‌গুলি একই ভাষার উপভাষা ছিল। তা সন্ধান করে তাদের উপাদান সূত্রেই মূল ভাষার রূপটি গড়ে তোলা হয়। অন্য দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

৩০১.৩.৯.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির সঙ্গে কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পদ্ধতির সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা করো।

৩। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

৪। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির উদ্ভবের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক কী? এই পদ্ধতির চারজন বিজ্ঞানীর নাম ও তাঁদের গ্রন্থের নামের বাংলা অর্থ লেখো।

৫। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় কী কী পর্ব আছে? পর্বগুলির অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বলো।

৬। টীকা লেখো : ঐতিহাসিক পর্ব, প্রাগৈতিহাসিক পর্ব।

৩০১.৩.৯.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। আজাদ, হুমায়ুন : তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

২। Lehmann, Winfred P : Historical Linguistics.

৩। Arlotto, Anthony : Introduction to Historical Linguistics.

৪। Giles, P : A short Manual of Comparative Philology.

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১০

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৩.১০.১ : ভাষার ব্যাকরণ—বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান সংজ্ঞা, পার্থক্য বিশ্লেষণ
৩০১.৩.১০.২ : ভাষা উদ্ভবের তত্ত্ব
৩০১.৩.১০.৩ : ব্যাকরণের বিষয়
৩০১.৩.১০.৪ : বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান
৩০১.৩.১০.৫ : ভাষাবিজ্ঞানের দুই শাখা—ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান
৩০১.৩.১০.৬ : ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা
৩০১.৩.১০.৭ : ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক তুলনা
৩০১.৩.১০.৮ : ভাষার শ্রেণিবিভাগ
৩০১.৩.১০.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৩০১.৩.১০.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.৩.১০.১ : ভাষার ব্যাকরণ—বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান সংজ্ঞা, পার্থক্য বিশ্লেষণ

ভাষা মানুষের ভাব বিনিময়, সংযোগ, সম্পর্ক নির্ণয়ের এক অভূতপূর্ব শক্তি। তথ্যসঞ্চয়, বিন্যাস উপস্থাপনের আশ্চর্য এই শক্তি মানুষকে অন্যান্য পশু-প্রাণীকুল থেকে স্বতন্ত্র করেছে। ভাষা মানুষের চিন্তাকে নির্দিষ্টতা দেয়—আবেগাত্মক মনোবৃত্তির আদান প্রদানের সহায়তা দান করে। ভাষা মানুষকে সমাজগঠনের প্রেরণা দিয়েছে। ভাষা অন্তত দুজনের মত বিনিময়, ভাব বা আবেগাত্মক সংযুক্তির ভূমিকা নেয়। ভাষা পরিবার গঠনে সাহায্য করেছে—পরিবার থেকে কোম (clan), কোম থেকে জনগোষ্ঠী (ethnicity), জন থেকে সমাজ (society) তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

ভাষা আসলে এক ধরনের প্রতীকের নির্মাণ ও বির্নিমাণ।—code বা চিহ্ন; codification বা চিহ্নায়ন, আর decodification তাৎপর্য নির্ণয়। ভাষায় দুটি দিক : ১। মৌখিক আর ২। লেখ্য রূপ। মৌখিক ভাষাই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের মূল বিবেচ্য। লেখ্যরূপের ভাষা আসলে সাহিত্যিক নির্ভর হয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

মৌখিক ভাষার মতো জীবন্ত নয় লেখ্য ভাষা। মৌখিক ভাষা ক্রমান্বয়ে নিত্যনতুন রূপ পরিগ্রহ করে—নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সংযোগে মৌখিক ভাষা নির্দিষ্টতা লাভ করে লেখ্যভাষার মারফৎ। তার দ্বারা তৈরী হতে থাকে ভাষার রীতিনীতি বিন্যাসভঙ্গির বিধিবদ্ধতা। ভাষার এই বিধিবদ্ধতাই ব্যাকরণ।

ভাষার সংজ্ঞা : ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে পণ্ডিতরা নানা রকম সংজ্ঞা বা বিবেচনা এনেছেন। তাদের মধ্যে সর্বসম্মত কোনো সংজ্ঞা এখনও স্থির হয়নি। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত স্টুরটেভাস্ট এইচ. ইউগার-এর 'An Introduction to Linguistic Science'-এর একাংশে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অনেকেই গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। ইডগারের সংজ্ঞা—

'A Language is a system of arbitary vocal symbols by which member of a social group co-operate and interact.'

ভাষা হল কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর পরস্পর সংযোগ ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়া আকস্মিকতার মারফৎ তৈরি উচ্চারণ-প্রতীকের বিধিবদ্ধ রূপ। —মোটামুটি এই হল ইউগার-এর কথা। মানুষ বাগযন্ত্রের মাধ্যমে এসব উচ্চারণ-প্রতীক অর্থ ও তাৎপর্য তৈরি করতে না পারলে—তাকে পুনঃ পুনঃ একই অর্থে ব্যবহার করতে না পারলে ভাষা হয়ে উঠবে না উচ্চারণ-প্রতীক বা vocal symbols. হাততালি, শিস, জিভের সাহায্যে পশুপাখির ডাকের নকল, বস্তুর সাহায্যে তৈরি করা শব্দকে ভাষা বলা হবে না। গৃহপালিত কুকুরকে ডাকতে বা প্ররোচিত করার জন্য মানুষ কিছু শব্দ ব্যবহার করে, পাখি তাড়াতে, গরু চরাতে, লাঙ্গল দেবার সময়, গোরু বা ঘোড়ার গাড়ি চালানোর সময় ব্যবহৃত শব্দাবলির কোনো না কোনো সীমিত তাৎপর্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু এসবকে ভাষা বলা যায় না। সুতরাং arbitrary -বিশেষণটি কিছুটা রহস্যজনক, এর ভেদ ও তাৎপর্য সন্ধান জরুরি।

ভঙ্গি নয়—ভাষা হল বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনি বা উচ্চারণ যা পুনঃ পুনঃ একই অর্থে একই ভাবে একজন ও সমাজবদ্ধ সমস্ত মানুষ ব্যবহার করতে পারেন। অন্যথায় তাকে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

উচ্চারিত ধ্বনি বাগযন্ত্রের দ্বারা উপস্থাপিত বা সৃষ্ট হলেও সর্বদা ভাষা হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে। 'শিশুর অস্ফুট চিৎকার' বা 'পাগলের অর্থহীন ধ্বনি'-কে অধ্যাপক রামেশ্বর শ' ভাষা বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে 'ধ্বনি যদি কোনো ভাবের বাহন বা প্রতীক না হয়, তা হলে তাকে ভাষা বলা যায় না।' (দেখুন : ড. রামেশ্বর শ' : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, ৯ পৃঃ)। ভাষা তাই শুধু ধ্বনি নয় Sound-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট ভাবের আশ্রয় করে সেই ধ্বনি। একে বলতে হবে meaning.-এর প্রথমটিকে বলতে পারি আকার বা আদল—form আর দ্বিতীয়টিকে বলতে পারি আশ্রিত অন্তর্বস্তু — content.

ফার্দিনান্দ দে সেস্যুরে ভাষাকে বলেছেন 'a system of sign that express ideas' (Course in General Linguistics); তৃতীয় পরিচ্ছেদ; ম্যাকগ্রো-হিল বুক কোম্পানি; নিউ ইয়র্ক, টোরোন্টো, লন্ডন; ১৯৬৬ মূল বই-জেনেভা থেকে জুলাই ১৯১৫-তে প্রকাশিত। অর্থাৎ ভাষা হল চিহ্নায়ন পদ্ধতির সাহায্যে

ভাব প্রকাশের রীতি। সেস্যুরের মতে ভাষার একাংশে ব্যক্তিগত উচ্চারণ, অন্য অংশে ভাব প্রকাশ বা অনুভবের সামাজিক উপাদান। একটি ছকের দ্বারা বিষয়কটিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সেস্যুরে। ছকটি এই :

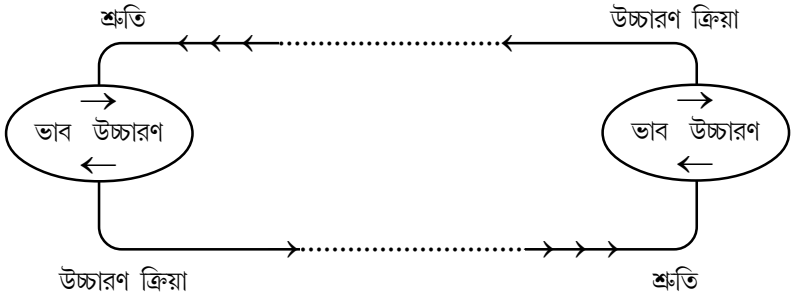

সেস্যুরে ভাবকে concept উচ্চারণকে sound image, উচ্চারণ ক্রিয়াকে phonation আর শ্রুতিকে audition বলেছেন। ভাষা এই দুই-এর মিশ্রণে পূর্ণতা পায়। ব্যক্তি থেকে সমাজ, ভাব থেকে মনস্তত্ব—সর্বাতিশায়ী ক্ষেত্র হিসেবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে ভাষা।

স্টুরটেভান্ট যে বলেছেন ভাষার প্রথম উপকরণ ধ্বনি প্রতীককে কোনো 'কার্যকারণগত সুনির্দিষ্ট নিয়ম'-এ বাঁধা পায় না—তাকে রহস্যময় বলেছি। একে 'মানুষের খেয়াল অনুসারে নির্বাচনের উপরে' নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। উদাহরণ হিসেবে ড. রামেশ্বর শ' নানান ভাষা থেকে জলের প্রতিশব্দ এনেছেন। তাঁর মতে বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ভাষার *জল*, গ্রীক *হুদর*, লাতিন *আকোয়া*, ইংরেজী *ওয়াটার*, ফরাসী ও বা জার্মান ভাষার—হিন্দী, উর্দু *পানী*—কোনোটিই জল নামক তরল পদার্থটির সঙ্গে কোনো কার্যকারণ সূত্রের কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তিনি দেখতে পাননি। ধ্বনি সমষ্টিগুলো সম্পূর্ণ কার্যকারণ সূত্রহীন—arbitrary.

বহু শব্দ কিন্তু অনুকারী বা ধ্বন্যাত্মক। ঝড়, কল্লোল, বৃষ্টি, রিমঝিম, ঝংকার, টংকার, গর্জন—প্রভৃতি বহু শব্দ নিশ্চয় অনুকারী। বাস্তব পরিবেশের অনুকরণ এসব শব্দে খুবই স্পষ্ট। সব ভাষাতেই এরকম আছে। এসব ক্ষেত্রে ধ্বনিকে arbitrary বলা যায় না।

ভাষাকে যখন অক্ষরমালার দ্বারা উপহার দেওয়া হয়—যখন ধ্বনিরূপ চিত্রধর্ম লাভ করে, দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতীক বা চিহ্নায়ন চলতে থাকে তখনও কোনো কোনো সময় কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। বাহ্মী হরফে চিত্রলিপির ইঙ্গিত লক্ষ করেছেন কোনো কোনো লিপি তত্ত্ববিদ। যেমন ম-উচ্চারণের চিত্র প্রতীকটি ছিল ৪-এর মতো। ক-উচ্চারণের চিত্র প্রতীকটি ছিল (†) -এর মতো। বহ্লারের মতে এই শব্দগুলির দ্বারা সবথেকে বেশি যে পদগুলি ব্যবহৃত হত তার সঙ্গে চিহ্নগুলির সম্পর্ক আছে। ম ছিল মৎস্য রূপ (৪), ক ছিল কর্তার (†)। একই ভাবে ধনুক-এর রূপ ধ-এর চিহ্ন প্রতীক D-এর মধ্যে থাকে। D বা ᗡ। এটি অনেকটাই ধনুকের মতো। কারণ ধ-উচ্চারণে সব থেকে পরিচিত চিহ্নটি ধনুকের স্মৃতিচিহ্নিত। সুতরাং সবক্ষেত্রেই ধ্বনিকে, ধ্বনিপ্রতীক বা অক্ষরকে arbitrary বলা চলে না।

ভাষার শব্দ আর অর্থ কোনো নির্দিষ্ট মৌখিক সম্পর্ক নাও রাখতে পারে তবে তা কোনোকালেই কোনো যুক্তি অবলম্বন করেনি—একথা মানা যায় না। অর্থ পরিবর্তনশীল। অর্থ প্রাথমিক যুক্তি থেকে ক্রমেই নতুন নতুন তাৎপর্য অবলম্বন করতে পারে। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ে—এই বাক্য উপস্থাপনের সময় মুষল নিক্ষেপ

করা, আদিম ধরনের যুদ্ধসংস্কৃতি পরিবেশ স্মরণে আসে। সময় বদলে গেছে অর্থের তাৎপর্য থেকে গেছে আদিম সংস্কৃতির ঘেরাটোপে। শব্দের দেশ-কাল-পাত্র পরিচ্ছন্ন রূপও পাওয়া যায়—সাম্প্রদায়িক চেহারাও স্পষ্ট হতে পারে। 'ফ্রেঞ্চ লিভ'—অনুমোদন হীন ছুটি। শব্দবন্ধটি ইংরেজীতে চালু—ইংরেজদের গোপন ফরাসী জাতি সম্পর্কে, তাদের কর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। বাঙ্গালি হিন্দু এখন জল অর্থে পানি ব্যবহার করে না—বাঙালি মুসলমান পানি ছাড়া জল ব্যবহার করতে চায় না। অথচ দুটি শব্দই তৎসম—সংস্কৃত আগত।

ধ্বনি (Sound)-র সঙ্গে শ্রুতিমাধুর্য শিল্পগৌরব লক্ষ করেছেন কেউ কেউ। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত'-ব্যাখ্যান থেকে ড. রামেশ্বর শ' অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিখেছিলেন : ..... 'সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর। অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি রেবা সিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে।' (প্রাচীন সাহিত্য)। ড. রামেশ্বর শ'-এর বিচিত্র সংযোজন : এখানে 'দর্শন', 'অবন্তী', 'বিদিশা', 'উজ্জয়িনী' প্রভৃতি নামের বদলে যদি 'খাগড়া', 'খড়্গাপুর', 'হাবিবপুর', 'হোটর' ইত্যাদি নাম ব্যবহার করা হত তবে সেই শোভা, সেই সম্ভ্রম, শুভ্রতা ফুটে উঠত না। কিংগ 'বেরা', 'সিপ্রা', 'বেত্রবতী'-র বদলে 'খ'রে, 'মাথাভাঙা', 'কাঁসাই' নাম ব্যবহার করলে নদীকে বোঝাত বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে যুক্ত সেই যুগের শ্রী-সৌন্দর্যটুকু ধরা পড়ত।' (সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, উক্ত ১২ পৃ:)। এরপর ড. শ' এসেছেন শব্দ অর্থের 'প্রসঙ্গগত' সম্পর্ক—Contextual meaning'-এর কথায়। এরপরই তাঁর সিদ্ধান্ত ধ্বনির সঙ্গে অর্থের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই—একথা মাননীয় নয়। অথচ একটু আগেই তিনি 'vocal symbol'-এর 'arbitrary' সম্পর্কের কথা সমর্থন করেছেন। আসল কথা—শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক বহু সময়ই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। তা বলে বলা যায় না—এসম্পর্ক নিতান্তই আপতিক।

৩০১.৩.১০.২ : ভাষা উদ্ভবের তত্ত্ব

ভাষা উদ্ভবের ক্ষেত্রে কয়েকটি তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে। তত্ত্বগুলির মধ্যে চারটি প্রধান। যথা :

১. প্রকৃতি-প্রত্যয় তত্ত্ব — Root Theory

২. আপতিক বা আকস্মিকতার তত্ত্ব — Anomalist Theory

৩. সাদৃশ্য সন্ধান তত্ত্ব — Analogist Theory

৪. বিধিনির্দেশ তত্ত্ব — Theory of System

প্রকৃতি-প্রত্যয় তত্ত্বটি ভারতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি ও তাঁর অনুগামীদের। পাণিনি দেখিয়েছেন প্রত্যেক শব্দের উৎসে কোনো না কোনো সংক্ষিপ্ত ধাতু বা অর্থবীজ আছে। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় বা প্রকৃতি-প্রত্যয় করলে এই অর্থবীজের প্রসার বা বিস্তার লক্ষ করা যায়। যে-কোনো শব্দের গভীরে ধাতুর এই অর্থ বীজ থাকা ও তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভাষার উদ্ভবের একটি ধারণা স্পষ্ট হয়।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ধাতুগুলির মূল বা সরল রূপ ক্রমে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মারফৎ পরিবর্তিত হতে থাকে। বদ্ ধাতুর গুণ বদতি, বশংবদ প্রভৃতি শব্দে, বৃদ্ধি (অর্থাৎ

স্বর-যোগ) যথা—বাদ, অনুবাদ, সংবাদ, বিবাদ প্রভৃতি শব্দে বিবর্তিত হয়েছে। একইভাবে যজ্ ধাতুর যজতি, যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দে, বৃদ্ধি যাজক, যাগ, যাজ্ঞিক প্রভৃতি শব্দে ঘটেছে। তাঁর সিদ্ধান্ত 'ধাতুর দ্বয়ের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণত্মক পরিবর্তন সংস্কৃতের ন্যায় ভারতের বাহিরের তাবৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মিশে। এই রূপ পরিবর্তন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।' ('বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৫০, ৮২ পৃঃ)। এভাবেই প্রকৃতি প্রত্যয় তত্ত্ব বা Root Theory বিকশিত হয়েছে। এ বিষয়টি ড. রামেশ্বর শ' তাঁর উক্ত গ্রন্থে একটু সংক্ষেপে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ ভাবে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন। রাম ও রাবণ-এর অর্থ ব্যাখ্যান করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রক্তকরবী' নাটক বিষয়ক আলোচনায় । তাকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ড. শ'। (দেখুন — ১২ পৃঃ)। এভাবে ধাতুর প্রকৃতি প্রত্যয়ের গুণ বৃদ্ধি সম্প্রসারণের তাত্ত্বিক কাঠামোটি ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না।

আপতিক বা আকস্মিকতার তত্ত্ব হল ধ্বনি আর অর্থের খেয়ালখুশি মতো নির্বাচনের—'arbitrary'-প্রয়োগের তত্ত্ব। এই দৃষ্টিতে গোটা বিষয়টি যুক্তির ধার ধারে না—এ হল anomaly, আর ভাষার উৎসে শব্দ (sound) আর অর্থ (meaning)-এর কোনো রকম সঙ্গতি রক্ষা করতে না পারার বিষয়টিকে এই তত্ত্ব প্রাধান্য দেয়। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখার মতো ব্যাপার ভাষায় থাকে। কিন্তু অধ্যাপক রামেশ্বর শ' যেভাবে বিষয়টি এনেছেন, তা খুব অর্থবহ মনে হচ্ছে না। যথা : ..... 'আধুনিক সমাজে সবচেয়ে বীভৎস অসুর প্রকৃতির লোকেরও নাম রামচন্দ্র হতে পারে। কিংবা কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন খুবই শোনা যায়। সেসব ক্ষেত্রে অবশ্য শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তিটি চাপা পড়ে যায়।' ('সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'; ১৩ পৃঃ)। অধ্যাপক শ' এই ব্যাখ্যায় শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি চাপা পড়ে যাওয়ার জন্য নামের অনর্থ বা ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে দায়ী করেছেন—এসব কথা দিয়ে ভাষার কোনো রহস্যভেদ হয় না। তাছাড়া রামচন্দ্র নাম রাখার সময় ঐ মানুষটির আত্মীয়স্বজন তো জানতেন না সে 'অসুর প্রকৃতির' হবে! ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে এরকম উদাহরণ বিভ্রান্তিকর সন্দেহ নেই। বস্তুত ভাষা শুধু শব্দ নির্ভর নয়। শব্দ পদে পরিণত হয়—পদ অন্বিত হয় বাক্যে। বাক্য থেকে ভাবপ্রকাশ হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম শব্দের অর্থ তাৎপর্য ও অনর্থপাত খুব বেশি বিবেচনার যোগ্যই নয়। আপতিক বা আকস্মিকতার তত্ত্ব (Anomalist Theory)-এর বিচার এভাবে অসম্ভব।

সাদৃশ্য সন্ধান তত্ত্ব বা Analogist Theory তত্ত্বটি Anomalist Theory-র সম্পূর্ণ বিপরীত। এই তত্ত্ব অনুসারে ভাষা উদ্ভুত হয় সাদৃশ্য থেকে। সদৃশ্য বা analogy থেকে তত্ত্বটিকে Theory of Analogy বা Analogist Theory বলা হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'চট্, সাঁ, টক্‌টক, থরথর, ছট্‌ফট, হিজিবিজি—ইত্যাদি অনুকারী শব্দ দেশী শব্দ। এগুলি অজ্ঞাতমূল। (দেখুন : 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', উক্ত; ৫৫ পৃঃ)। অনুরূপ বেশ কিছু শব্দই ভাষার আদি রূপটি গড়ে তোলে। কিছু শব্দ তৈরি হয় হাবভাব উচ্চারণ ভঙ্গির সঙ্গে মিলে মিশে। মাথা নাড়া, হাত তোলা, পা ছোঁড়া, ঠোঁট নাড়া—জিভ কাটা বা ঐরকম কিছু শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করা হয় তার ইঙ্গিতও এই শব্দ গুলিতে থাকে। আর এর সঙ্গে ব্যক্তির ভাবভঙ্গি অনুকরণ করা হয়ে থাকে। Analogist-রা মনে করেন ভাষা উদ্ভবের পিছনে মানুষের পিছনে মানুষের এরকম চিন্তা বা ব্যবহারের অনুসরণ বা সাদৃশ্যের বিশেষ ভূমিকা থাকে।

বিধি নির্দেশ তত্ত্ব বা Theory of System-এর পক্ষপাতীরা মনে করেন ভাষা যেহেতু ভাব প্রকাশ তাই ভাব প্রকাশের সঙ্গে বিধি বা রীতির ভূমিকা যথেষ্ট। বিধি বা system, রীতি বা manner ভাষার সঙ্গে রীতি বিধি অর্থাৎ শব্দবিন্যাসের নির্দিষ্ট পদ্ধতির ভূমিকা বিদ্যমান। রাম ভাত খায়, পাখি আকাশে ওড়ে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হিসেবে পরিচিত। — বাক্য তিনটিতে এক বিশেষ ধরনের পদবিন্যাস মানা হয়েছে। কর্তা কর্ম ক্রিয়া-র পরস্পর যোজ্যতার রীতি। ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে S O V (Subject Object Verb)-এর ক্রমিক বিন্যাসরীতি আবিষ্কৃত হওয়া— তা একটি সমাজে সর্বাঙ্গীন মান্যতা লাভ করা, প্রভৃতি পূর্বশর্ত ঠিকমত মান্য না হলে ভাষার কোনো প্রয়োজনই থাকে না। অর্থবোধ, তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্য এই system বা manner -টি উদ্ভূত হওয়া স্বীকৃত পাওয়া জরুরি। যেকোনো ভাষার ক্ষেত্রে এই রীতিনীতি বিধি বা পদ্ধতির প্রয়োজনটি লক্ষিত হয়। ভাষা উদ্ভূত হওয়ার এই ব্যাখ্যা যাদের তাদের মতটি এভাবে বিকাশ লাভ করেছে। এই তত্ত্বকে Theory of System বা manner বলা হয়। শব্দ নয় অন্বিত পদ ও বিন্যস্ত ভাবকে এই তত্ত্বে ভাষার আদি বলে স্বীকার করা হয়।

সামাজিক উপযোগিতার তত্ত্ব ভাষা উদ্ভবের পরবর্তী তত্ত্ব। ভাষা সমাজের উপযোগিতা অর্থাৎ Social utility কে প্রাধান্য দিতে চায়। বস্তুত ভাষার প্রধান ক্ষেত্রই হল সামাজিক উপযোগিতা — মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরী করার ক্ষেত্রে ভাষার এই ভূমিকাটি সকলেই স্বীকার করবেন। ১৯৭০-এ প্রকাশিত ড্ব্লু লাবোভ-এর বই 'The Study of Language in its Social Context'-এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষা বিবর্তনে সমাজ-সম্বন্ধ নিবিড়। লাবোভ-এর সিদ্ধান্ত : 'Linguestic and Social structure are by no means co-extensive'. ভাষাবিজ্ঞান আর সামাজিক সংগঠনের সম্পর্ক পরস্পর পরিপূরক। এই ধারণা থেকেই ভাষা উদ্ভবের ক্ষেত্রে Theory of Social utility গড়ে উঠেছে। স্টুরটেভান্ট-এর উল্লেখিত সংজ্ঞায় এই প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে ভাষার মারফৎ সমাজের সদস্যররা পরস্পর সহযোগিতা ও সংযোগ স্থাপন করে—'by which the member of a social group co-operate and interact'. ভাষার এই আদি প্রয়োজনটি মনে রেখেই ভাষার উদ্ভব সম্পর্ককে সামাজিক উপযোগিতা তত্ত্ব (Theory of Social utility) গড়ে উঠেছে।

ড. সুকুমার সেন ভাষার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ 'মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজন বোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।' (ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৯৭৯; ২ পৃঃ)। কিছু পরে প্রায় এই সংজ্ঞাটিই অন্যরকম ভাবে উত্থাপন করেছেন সুকুমার বাবু। যথা ঃ 'ধ্বন্যারূঢ় প্রতীক দ্যোতনাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ'। (ঐ; ৩ পৃ:)।

৩০১.৩.১০.১ : ভাষার ব্যাকরণ, বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান

সংজ্ঞা পার্থক্য বিশ্লেষণ

ভাষা বিশ্লেষণকে ব্যাকরণ নামে অভিহিত করা হয়। ব্যাকরণ অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Grammar. Grammer বলতে বোঝানো হয়—ভাষার অন্তর্গত বাক্য রচনার সময় শব্দ ব্যবহারের রূপান্তরের নিয়ম সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা; 'the rules in a language for changing the form of words and joining

them into sentences.' (দেখুন : Sally Wehmeier-সম্পাদিত 'Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English', Oxford University Press প্রকাশিত; ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০০; 599 পৃ:)। ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা। যে ভাষা চলমান, বহমান — নিত্যনতুন ভাষা পরিস্থিতির মধ্যে ভাঙ্গাগড়ার অনন্ত প্রবাহের মাধ্যমে সমাজ শরীর তরঙ্গ তুলছে — ব্যাকরণ তার মধ্যে একটি বিধিবদ্ধতা আরোপ করার চেষ্টা করে।

ভাষা বিশ্লেষণের সাধারণ নাম ব্যাকরণ। তবে ব্যাকরণ সাধারণভাবে রক্ষণশীল। ভাষার শুদ্ধ রূপ নিয়ে ব্যাকরণের কারবার। শুদ্ধ রূপটির তাৎপর্য ব্যাকরণের লক্ষ্য। শুদ্ধ বা মার্জিত রূপ বলতে বোঝানো হয় একটি নির্দিষ্ট আদর্শ। ভাষা কখনই সেই আদর্শকে স্পর্শ করে না — আদর্শটি বৈয়াকরণের মনে বাস করলেও করতে পারে। ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে বিষয়টির প্রমাণ পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'। ব্যাকরণটি প্রচলিত হবার সময় সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাকৃতের প্রচলিত রূপের মধ্যে শুদ্ধ ও মার্জিত রূপটি ভেবে পাণিনি সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ঘটালেন। ভাষাকে রীতির নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ করে প্রথম ভাষা পরিকল্পনা (Language Planning)-র নিদর্শন পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'। মতটি স্বীকার করলেও অধ্যাপক মনসুর মুসা লিখেছেন এরকম ভাষা পরিকল্পনা পৃথিবীর হাজার দেড়েক ভাষাসংস্থার কার্যকলাপে লক্ষিত হয়। (দেখুন : "ভাষা পরিকল্পনা"-প্রবন্ধ, 'ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ'-গ্রন্থভুক্ত, মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮৪; ১০৪ পৃ:)।

ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করতে চায়—সংস্কার করতে চায়। প্রাকৃতকে সংস্কৃত করাই ব্যাকরণের লক্ষ্য। এই জন্য ব্যাকরণকে Normative Grammar নামে অভিহিত করা হয়। ভাষায় শুদ্ধ রূপ বা norm রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়। H. C. Wyld Normative Grammar-এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ভাষার বেঠিক রূপ নির্ধারণ করার অধিকার বৈয়াকরণের থাকা উচিত নয়।

উইল্ড-এর মতে ভাষা মানুষের মনোভাব প্রকাশ করলেই তার কাজ সম্পন্ন হয়, সুতরাং অশুদ্ধ রূপ বলে কিছু হতে পারে না। সুতরাং ব্যাকরণবিদ-রা যখন ঠিক বা ভালো বলে কিছু নির্দেশ দেন তখন তা ঠিক কাজ হয় না। 'grammarians have absolutely no authority to prescribe what is 'right' or 'wrong' but can merely state what is the actual usage এভাবে দেখলে ব্যাকরণের কাজ ভাষার রীতি নিয়ম নির্দিষ্ট করা — ঔচিত্যের ধারণা প্রয়োগ করে নীতি নির্ধারণ ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নয়। ভাষার যে রূপ 'বাস্তবে প্রচলিত আছে তা বিশ্লেষণ করাই বৈয়াকরণের উদ্দেশ্য।' (ড. রামেশ্বর শ' : 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'; উক্ত, ২১ পৃ:)। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত ব্যাকরণকে বাস্তব ব্যাকরণ বা Positive Grammar নামে অভিহিত করতে চান আধুনিক বৈয়াকরণরা।

ভারতীয় ব্যাকরণবিদরা রক্ষণশীল। তাঁরা মনে করেছেন ব্যাকরণের উদ্দেশ্যে ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ, তাঁদের মনে হয়েছে বৈদিক আর্যভাষা ছিল বিশুদ্ধ—কালের প্রবাহে তা অশুদ্ধ হয়ে গেছে। স্থান ও কালের বিবর্তনে ভাষার এই প্রাকৃত রূপ তাঁরা পছন্দ করেননি। তাঁরা 'বৈদিক ভাষা'কে 'দেবভাষা' বলে শ্রদ্ধা করতেন আর দেবভাষার রূপ অপরিবর্তিত রাখার জন্য রচনা করলেন ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণকে সেক্ষেত্রে ঐতিহ্য-অনুশাসিত বা Traditional Grammar বলে অভিহিত করা হয়। যুগগত পরিবর্তন তাদের চোখে বিকৃতি। এই বিকৃতি রোধ করার জন্য ভারতীয় সংস্কৃত ব্যাকরণগুলি রচিত হয়েছে।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-কে Traditional Grammar বলে গ্রহণ করলে কালোত্তীর্ণ প্রতিভা পাণিনি সামর্থ্য ও বিশ্লেষণবুদ্ধিকে সঠিক অর্থে সম্মান জানানো অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভাষা বিশ্লেষণে পাণিনির বহুমাত্রিক সাফল্য সে সময়ের পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। যুক্তিশীলতা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চমৎকারিত্বে পাণিনি সংস্কৃত ভাষাকে বাস্তব ব্যাকরণের মতো বিশ্লেষণ করেছিলেন।

অধ্যাপক সুকুমার সেন ব্যাকরণকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে—'ব্যাকরণের আলোচনা তিন ভাবে হয়।' (১) বর্ণনামূলক ব্যাকরণ (Descriptive Grammar), (২) ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical Grammar) এবং (৩) তৌলন বা তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar)। (পশ্য : 'ভাষার ইতিবৃত্ত'; তৃতীয় অধ্যায়; ২৩ পৃ:)। ড. রামেশ্বর শ' এই মত মানেন না। তাঁর মতে এই বিভাজনের একটি অন্যটির সঙ্গে মিলে মিশে আছে। একে বলা যেতে পারে 'overlapping'। বস্তুত তুলনামূলক ব্যাকরণ 'ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক উভয় দৃষ্টিতেই' আলোচিত হতে পারে। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষাগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়—বংশলতা genealogical table তৈরি সেই ভাষালোচনার লক্ষ্য ছিল। কোনো নির্দিষ্ট ভাষা থেকে ক্রমে অন্য ভাষার বিকাশ ও পরিণতি বিশ্লেষণের জন্য এই ব্যাকরণগুলি একই সঙ্গে তুলনামূলক, ঐতিহাসিক আবার বর্ণনাত্মকও। সুতরাং এই তিনভাগে ব্যাকরণকে বিভক্ত করা যায় না।

বস্তুত তুলনামূলক ব্যাকরণ ব্যাকরণের কোনো পৃথক ধারা বলে স্বীকার করছেন না ড. রামেশ্বর শ'। তাঁর মতে তুলনামূলক পদ্ধতি সব ধরনের ব্যাকরণের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত করা সম্ভব। ধারা হিসেবে তুলনামূলক পদ্ধতিকে তিনি গ্রহণ করতে চান না। (সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা; উক্ত; ২৭ পৃ:)।

নির্যাস কথা হল ভাষা বিশ্লেষণ বা ব্যাকরণের পদ্ধতিগত বিভিন্নতা এই :

১. নির্দেশমূলক ব্যাকরণ (Normative Grammar)

২. বিধি নিষেধমূলক ব্যাকরণ (Prescriptive Grammar)

৩. শুদ্ধিবাদী, আদর্শ ব্যাকরণ (Purist / Ideal Grammar)

৪. ঐতিহ্যানুগত ব্যাকরণ (Traditional Grammar)

৫. বাস্তব ব্যাকরণ (Positive Grammar)

আধুনিক ব্যাকরণ বোধ অনুসারে বাস্তব ব্যাকরণই ভাষার বাস্তব বা প্রকৃত বিচার করে থাকে। ড. সুকুমার সেন 'চলিত ভাষার ব্যাকরণ-কাঠামো' হিসেবে যে বাংলা চলিত ভাষার 'ব্যাকরণ অর্থাৎ স্বরূপ নির্দেশ' করেছেন, তাকে বাস্তব ব্যাকরণ হিসেবে গণ্য করতে হয়। (দেখুন : ভাষার ইতিবৃত্ত'; ৩৯৯ পৃ:)।

৩০১.৩.১০.৩ : ব্যাকরণের বিষয়

ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাকরণের লক্ষ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। এজন্য ব্যাকরণের আলোচনার মূল ক্ষেত্র চারটি। যথা :

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

২. রূপ বিচার (Morphology)

৩. পদবিধি বা বাক্যরীতি (System) আর

৪. শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)।

('ভাষার ইতিবৃত্ত' : ড. সুকুমার সেন; ২৪ পৃ:)।

ড. রামেশ্বর শ' শব্দার্থতত্ত্বকে ব্যাকরণের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেননি। (উক্ত; ৩৯ পৃ:)। পরে অবশ্য একটি সারণীতে (উক্ত; ৫১ পৃ:) শব্দার্থতত্ত্বকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি।

ধ্বনিতত্ত্বকে ড. সুকুমার সেন ধ্বনিবিজ্ঞান বলতে চান। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনিবিচার (Phonemics) আর ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)। ড. রামেশ্বর শ'-এর মতে ব্যাকরণের বিষয়টি ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)। ধ্বনিতত্ত্বের তিনটি অংশ যথা :

১. ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)

২. স্বনিম বিজ্ঞান বা ধ্বনিবিচার (Phonemics)

৩. স্বনিমপ্রক্রিয়া বিজ্ঞান (Phonology)

ড. সুকুমার সেন আর ড. রামেশ্বর শ' এর স্ব-স্ব সংজ্ঞা নির্ণয় ও বিচার কিঞ্চিৎ সমস্যাজনক। বিষয়টির সমাধান হওয়া দরকার।

বাগধ্বনির তিনটি স্তর। ধ্বনি উদ্ভব, উচ্চারণ, তরঙ্গ সৃজন, শ্রবণ এই রকম বেশ কয়েকটি স্তর পার না হলে বাগধ্বনির ধারণা হয় না। তিনটি স্তর নিয়ে ভাষার আলোচনা খুবই প্রয়োজনীয়। এগুলির সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হওয়া দরকার।

ধ্বনি উচ্চারণ অর্থাৎ articulation হবার ক্ষেত্রে বাগযন্ত্রের নানা অংশের সঙ্গে (Organs of Speech or Vocal organs-এর) ধ্বনিতরঙ্গ, (Sound waves) তৈরী হওয়া শ্বাসবায়ুর যাত্রা, ঘর্ষণ, স্পৃষ্ট হওয়া পূরিত হওয়া—প্রভৃতিকে ঠিকমতো বুঝে নেওয়া উচ্চারণ মূলক স্বনবিজ্ঞান অর্থাৎ Articulatory Phonemics-এর আলোচ্য। এটি ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিদ্যা (Physiology)-রও বিষয়।

মুখাবয়ব থেকে ভাষা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ার পর ধ্বনিতরঙ্গ বা Sound Waves তৈরী হয়। এই বিষয়ে মান, মাত্রা ও রূপ বিষয়ে আলোচনা মূলত Acoustics-এর। ধ্বনিতরঙ্গ বিজ্ঞান তথা Acoustics-এর ক্ষেত্রটি পদার্থবিদ্যা (Physics)-এর অন্তর্গত।

উচ্চারণ মূলক স্বনবিজ্ঞান আর ধ্বনিতরঙ্গ বিজ্ঞান-এর সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক নিবিড়। তবে ভাষাবিজ্ঞান সংগীতের মতো বিশেষ (Particular)-নিয়ে আলোচনা করে না—তার লক্ষ্য নির্বিশেষ বা সাধারণ (General)। তাছাড়া সংগীত হল প্রয়োগমূলক—ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ ব্যাখ্যামূলক।

বাগধ্বনির তৃতীয় স্তর ধ্বনির শ্রবণ বা audition. একে বলতে হয় শ্রুতিমূলক স্বনবিজ্ঞান তথা শ্রবণ মূলক ধ্বনিবিজ্ঞান (Auditory Phonetics)। এ বিষয়টিও শারীরিক—শ্রবণযন্ত্রের ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে এর যোগ নিবিড়। শারীরবিদ্যা (Phisiology)-র সঙ্গে এই শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান তথা Auditory Phonetics-এর সম্পর্ক আছে।

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics), ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonology) আর ধ্বনিবিচার (Phonmics)-এর যথেচ্ছ ব্যবহারের দিকে চোখ পড়েছে ভাষাতাত্ত্বিক ফ্রান্সিস নেলসন-এর। তিনিও সমাধান করার চেষ্টা করেছেন এইভাবে। — 'Phonology is a converterm embracing phonetics and phonemics.' (দেখুন : 'The Structure of American English', নিউইয়র্ক, ১৯৫৮; ১ম পরিচ্ছেদ)।

ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনার জন্য ধ্বনি বা স্বন (Speech sound বা phone), পূরক-স্বন (Allophone), মূল ধ্বনি অর্থাৎ ধ্বনিতা বা স্বনিম (Phoneme)-এর আলোচনা করা হয়। সাধারণভাবে লিপি চিহ্নিত ধ্বনিগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ মূল ধ্বনি বা স্বনিম। রাম, পাখি, মধু, শ্যাম—শব্দগুলির মধ্যে রাম ও শ্যাম একটি মূলধ্বনি বা স্বনিম। পাখি, মধু—র স্বনিম সংখ্যা দুই—'পা', ও 'খি', 'ম' ও 'ধু'।

কিছু কিছু উচ্চারণ লিপির দ্বারা সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলি : *বেলা যে পড়ে এল জলকে চল*। আর 'সাগর বেলা'-আর উক্ত 'বেলা' একভাবে উচ্চারিত হয় না। একে বলা হয় Allograph. আনুরূপে ড. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন 'উল্‌টো' আর 'আল্‌তা' ধ্বনি দুটির অন্তর্গত ল্‌ উচ্চারণ একরকম নয়। এই পার্থক্যকে বোঝানো হয় পূরক-স্বন বা Allophone-এর দ্বারা। Allophone-কে কেউ কেউ উপধ্বনি বলেছেন।

রূপবিচার অর্থাৎ Morphology. ভাষার রূপ বিচার করার সময় মূল রূপ বা রূপিম অর্থাৎ morpheme-এর আলোচনা করা হয়। মূল রূপ বা রূপিম বলতে বোঝায় ভাষার সংক্ষিপ্ততম অর্থযুক্ত রূপ বা একক। ('Smallest meaningful unit')। রূপিম আর তার পরিবেশগত বৈচিত্র নির্ণয় করাকে morphemics বা রূপিমবিদ্যা বা রূপিম বিজ্ঞান বলা হয়।

মূল রূপ থেকে শব্দের গঠন কী ভাবে হয়? শব্দ আর ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি, প্রাতিপাদিক, অনুসর্গ, উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করার তাত্ত্বিক আলোচনা রূপ প্রক্রিয়াতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব অর্থাৎ morphology-র মূল আলোচ্য বিষয়।

বাক্যতত্ত্ব বা বাক্যরীতি—Syntax, একাধিক মূলরূপ বা শব্দ একত্র মিলিত হয়ে মনের কোনো ভাব প্রকাশ করলে বাক্য বা Sentence রচিত হয়। প্রত্যেক ভাষার বাক্যের মূল রূপগুলি সাজানোর নির্দিষ্ট রীতি আছে। পদবিধি বা বাক্যরীতির মাধ্যমে সেই নিয়মগুলি ঠিকমত খুঁজে নেওয়া বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে বাক্যতত্ত্ব বা Syntax-এর ক্ষেত্রটি তৈরি হবে।

রূপতত্ত্ব বা বাক্যতত্ত্বকে পৃথক ক্ষেত্রে বিচার না করে একসঙ্গে ব্যাকরণের অন্তর্গত করে আলোচনা করার পক্ষপাতী কোনো কোনো পণ্ডিত। তাঁরা মনে করেন রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব ব্যাকরণেরই দুটি উপবিভাগ।

ভাষা আলোচনা তথা ব্যাকরণের চতুর্থ বিষয়টি হল শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics. ভাষার প্রকাশ-রূপের বিবেচনার তিনটি দিক ভাষার মূল; যথা—ধ্বনি, শব্দ আর বাক্য। এগুলির উপর ভিত্তি করে ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব আর বাক্যতত্ত্ব—গড়ে উঠেছে। ভাষার অন্য প্রান্ত হল উপলব্ধির। ভাষা কেবল প্রকাশ করে না—তা শ্রোতা (বা পাঠক)-র মনে কিছু উপলব্ধির সঞ্চার করে। একেই বলতে পারি অর্থ—meaning. শব্দের অর্থগত তাৎপর্য বিচার ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কালের ক্রমাগতির সঙ্গে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। অর্থেরও বিবর্তন হয়। অর্থ প্রসারিত হয়, সংশ্লিষ্ট হয়, সঞ্চারিত হয়, আমূল অর্থান্তর ঘটে যায়। সন্দেশ শব্দার্থ ছিল সংবাদ, বর্তমান অর্থ দাঁড়িয়েছে সুসংবাদ-স্মারক মিষ্টদ্রব্য। 'পেনা' শব্দটি মূলে ছিল ইতালীয় অর্থ ছিল পাখির

পালক। পেন শব্দার্থ কলম। শব্দার্থ বিচারের বিষয়টিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা ব্যাকরণের অন্তর্গত করতে চান না।

শব্দার্থ তত্ত্বকে কাল ও সমাজের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হয়। ঐতিহাসিক আর সামাজিক পটভূমিতে অর্থ বিবর্তিত হয়। সর্বত্র শব্দের অর্থ সমান ভাবে বিবর্তিত হয় না। হিন্দী ভাষায় সন্দেশ শব্দের অর্থ এখনও সংবাদ।

৩০১.৩.১০.৪ : বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান

বাঙ্ মীমাংসা হল ভাষাতত্ত্ব। মধ্যযুগের ব্যাকরণ আলোচনা ক্রমে ভাষাতত্ত্ব বা Philology-নামক তত্ত্ববিদ্যা হিসেবে গড়ে উঠেছে। ভাষাতত্ত্বে ভাষার উদ্ভব বিকাশ ও তুলনার দিকে বেশি মনোনিবেশ করে। এই তত্ত্ববিদ্যাটি বিকশিত হয়েছে জার্মান ভাষাতাত্ত্বিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে। জার্মান ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করতেন বেদ-পূর্ব একটি ভাষাগোষ্ঠী ছিল। এই আদি আর্য ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশের তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য তার খুঁজতে চেয়েছেন আর্যভাষাভাষীদের একালে বিভিন্ন ভাষা উপকরণের তুলনামূলক আলোচনার মারফৎ। এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ভারত পর্যন্ত একটি বৃহৎ প্রব্রজন (racial migration) আর পশ্চিমে ইউরোপের নানা দেশে আর একটি জাতিগত প্রব্রজন (racial migration)-এর কল্পনা ও প্রস্তাব করলেন তাঁরা। ভারতে আগত আর্য ভাষাভাষীদের ইন্দো-ইরানীয় আর ইউরোপে আগত ভাষাভাষীদের তাঁরা ইন্দো-ইউরোপীয় বলে অভিহিত করতে চাইলেন।

এই তত্ত্ববিদ্যায় সামান্য কিছু কালোচিত ও ভৌগোলিক পার্থক্য ছাড়া ভাষাগুলির মধ্যে শব্দ-বাক্য-গঠনে আশ্চর্য মিল। ড. সুকুমার সেন-এর ভাষা : 'যে বিলুপ্ত মূল ভাষা হইতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার কোনো নিদর্শন অদ্যপি পাওয়া যায় নাই। তবে এই বংশের প্রাচীন ভাষাগুলির তৌলন আলোচনা হইতে এই মূল ভাষার মোটামুটি রূপ যে কেমন ছিল তাহা ধারণা করা হইয়াছে।' ('ভাষার ইতিবৃত্ত' : উক্ত; ৮০ পৃ:)।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞাতি-স্থানীয় ভাষা'-র সন্ধান দিতে গিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের যে তত্ত্ব তল্লাশ করেছেন তার মারফৎ একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্র গড়ে তোলা যায়। তাঁর মতে আদি আর্যভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখা ছিল এই কটি। যথা :

১. টিউনিক বা জার্মানিক
২. হেল্লেনিক বা গ্রীক
৩. আর্মেনিক
৪. আলবানীয়
৫. ইন্দো-ইরানীয়
৬. হিত্তী বা কানিসীয়
৭. কেলতিক
৮. ইতালিক

৯. তোখারীয়

১০. শ্লাবিক

১১. বালতিক

—এগুলির মধ্যে হিত্তী বা কানিসীয় এবং তোখারীয় ভাষা মৃত। কেলতিক আর ইতালিকের উৎস যে শাখা, তার সন্ধান মেলেনি। যাই হোক টিউনিক বা জার্মানিক ভাষা থেকে গথিক-ভাষা উদ্ভূত হয়, সে ভাষার চিহ্ন এখন মেলে না। তবে সেই বিলুপ্ত ভাষাগোষ্ঠী থেকে ইউরোপে ইংরেজী, জার্মান, ডাচ, ডেনমার্ক (ড্যানিশ), নরওয়ে (নরওয়েজিয়ান), সুইডেন (সুইডিশ)—এই ছটি জীবন্ত ভাষার বিকাশ ঘটেছে। কেলতিক ভাষা থেকে ওয়েলশ ও ব্রেতন (অর্থাৎ গ্রেট বৃটেনের ওয়েলশ আর বৃটেনের পুরোনো ভাষা) উদ্ভূত হয়েছে। আর আইরিশ ও গেলিক ভাষার বিকাশও ঘটেছে কেলতিক ভাষা থেকে। ইতালিক ভাষা থেকে লাতিন, লাতিন থেকে ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগীজ, প্রভেন্সাল, কাতালান, রুমানীয় প্রভৃতি বেশ কটি ভাষার বিকাশ ঘটেছে। হেল্লেনিক বা গ্রীক ভাষা থেকে প্রাচীন গ্রীক ও আধুনিক গ্রীক ভাষা বিকশিত হয়। শ্লাব ভাষা আর বালতিকের একটি সাধারণ উৎস ছিল—সে ভাষা এখন নিশ্চিহ্ন। শ্লাব ভাষা থেকে রুশ, চেখ, পোল, বুলগার, যুগোশ্লাব ভাষা উদ্ভূত। বালতিক ভাষা থেকে লিথুআনীয় ও লেট ভাষার উদ্ভব হয়েছে। আর্মেনিক ভাষা থেকে আর্মানী ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে প্রথমে তিনটি ভাষাগোষ্ঠীর জন্ম হয়। ইরানীয় আর্য, দরদীয় আর্য আর ভারতীয় আর্য। ইরানীয় আর্য থেকে প্রাচীন পারসীক আবেস্তি ভাষা। আর আবেস্তি ভাষা থেকে পহলবী ও আধুনিক পারসীক, পশ্‌তু, বালুচী, কুর্দী প্রভৃতি ভাষার বিকাশ ঘটেছে। ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম প্রকাশ বৈদিক ভাষায়। এর থেকে তিনটি ভাষা বিকশিত হয়েছে যাথা সংস্কৃত, পালি আর প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষা থেকে আজকের সমস্ত ভারতীয় ভাষা এবং সিংহলী ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।

ভাষাতত্ত্ব ক্রমে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর বিচার করতে চেয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন অস্ট্রিক (Auostric) বা দক্ষিণ দেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিন্যাস। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠী। এগুলির মধ্যে আছে অনেকগুলি দেশী-বিদেশী ভাষাগোষ্ঠী যেমন :

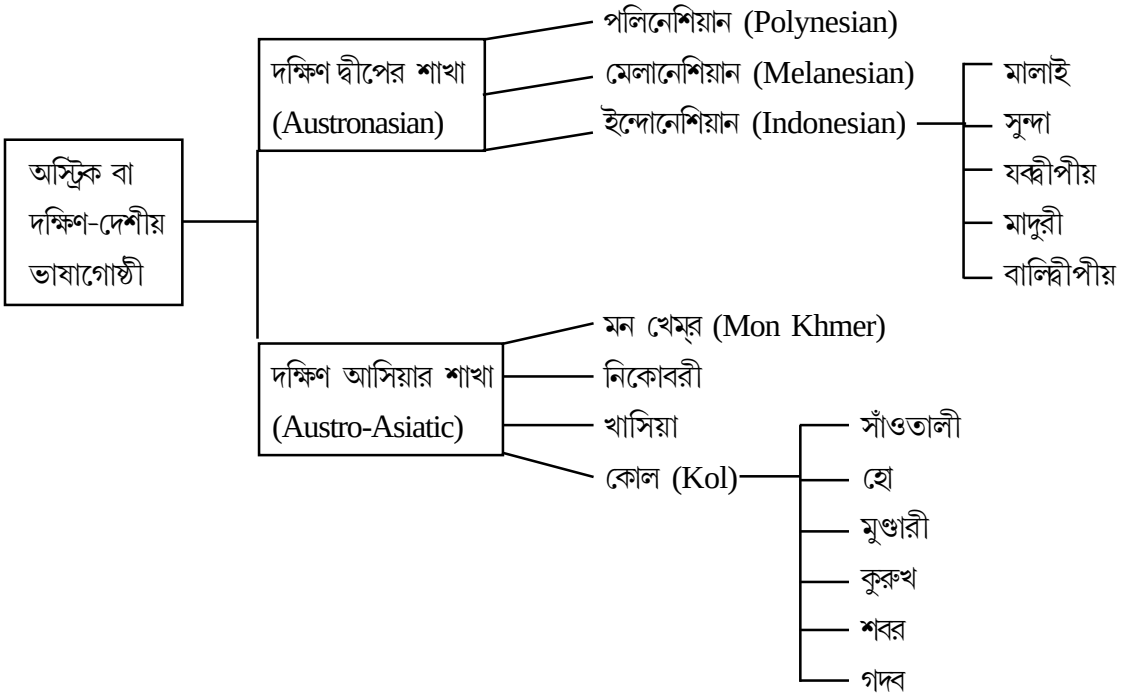

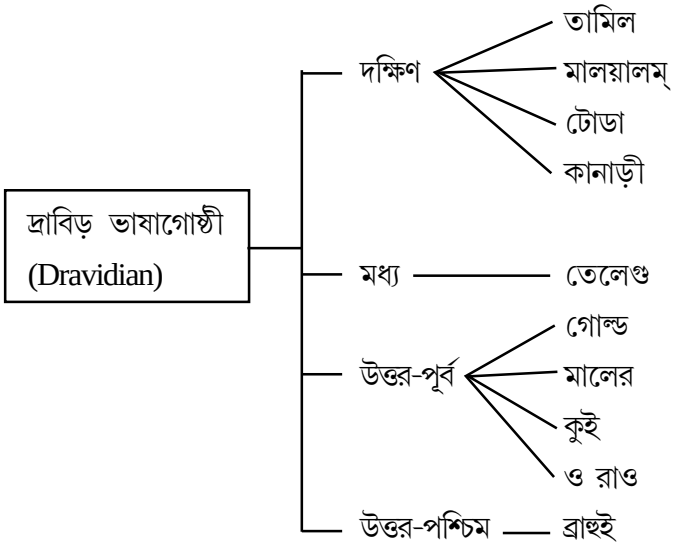

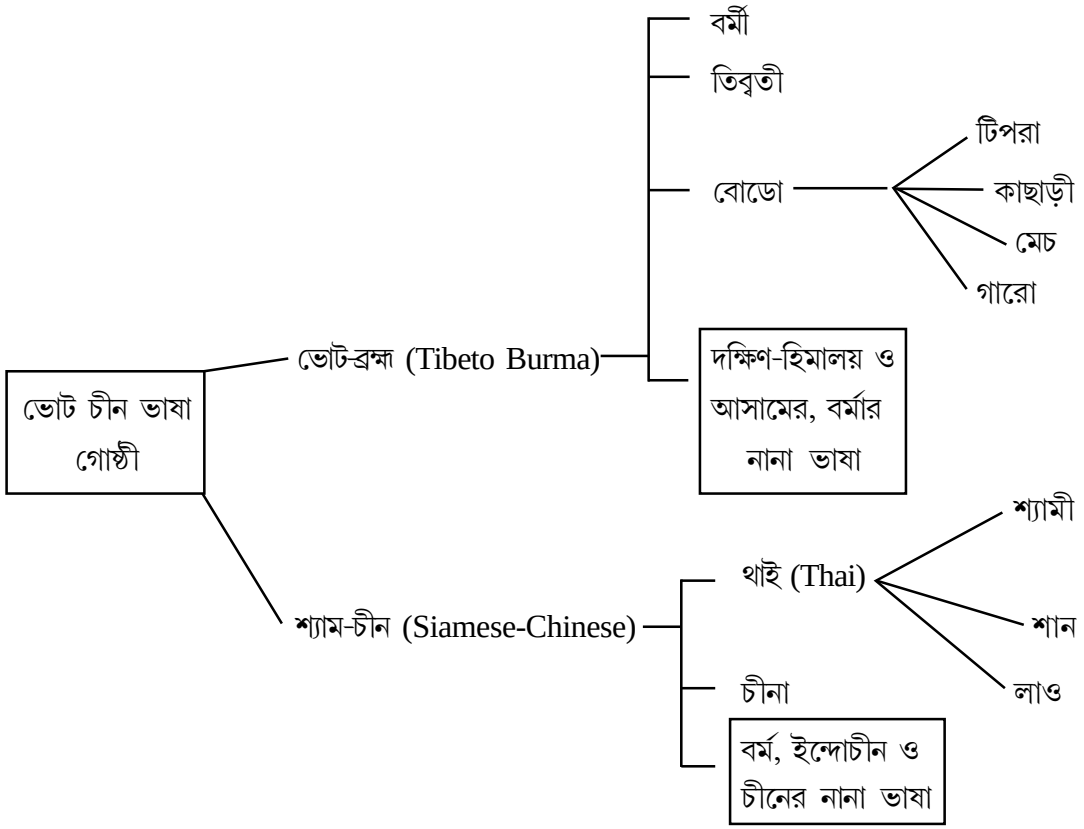

ড. সুকুমার সেন পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর উপর আলোচনা করে দেখিয়েছেন আরও কিছু ভাষা-বংশের পরিচয়। যেমন—

১. সেমীয়-হামীয় (Semitic-Homitic) : এই ভাষাবংশ দুটি বিভাগে বিভক্ত। সেমীয় আর হামীয়। অনেকে অবশ্য এই ভাষাবংশকে একটিই বলে ধরেন। সেমীয় শাখার অন্তর্গত ভাষাগুলি এইরকম :

সেমীয়
- পূর্বী উপখাশা : আসীরীয়, আক্কাদীয় বা বাবিলেনীয়
- পশ্চিমা উপশাখা : কনানীয়, কিনীসীয়, আরামীয়, হিব্রু
- দক্ষিণ উপশাখা : আরবী, আবিসীনিয়ায় ভাষাসমূহ

এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে হিব্রু আর আরবী গুরুত্বপূর্ণ। হিব্রুতে বাইবেলের আদি পুস্তক (Old Testament) আর আরবীতে কোরান রচিত হয়েছে। ভাষা দুটির বিশ্বব্যাপী প্রভাব যথেষ্ট।

হামীয়
- প্রধান মিশরীয় : কপটিক
- বেবের : লিবিয়ার কিছু ভাষা
- কুশীয় : সোমালিল্যান্ডের কিছু ভাষা

কপটিক ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীতে লুপ্ত হয়ে যায়। মিশরে প্রকাশিত হয় অরবী।

২. বান্টু। এই ভাষাগোষ্ঠী পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকায় প্রচলিত। সোয়াহিলী (swahili), কাফির (Kaffir), জুলু (Zulu) প্রভৃতি ভাষা বান্টু (Bantu) ভাষাগোষ্ঠীর।

৩. ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugric) : এই ভাষার অন্তর্গত ভাষার মধ্যে ফিনিস (Finnish, ফিনল্যান্ডের ভাষা), লাপ্পোনিক (Lapponic), এস্তোনিয়ার (Esthonian, এস্তোনিয়ার ভাষা), হাঙ্গেরিয়ান বা মাজ্যার (Hungarian বা Magyar — হাঙ্গেরির ভাষা প্রধান)।

৪. তুর্ক-মঙ্গোল-মাঞ্চু ভাষাগোষ্ঠী। এই ভাষাগোষ্ঠীর তিনটি প্রধান শাখা।

তুর্ক-তাতার :
- তুর্ক (Turkish)
- তাতার (Tartar)
- কিরঘিজ (Kirghiz)
- উজবেগ (Uzbeg)

মঙ্গোল : মঙ্গোলিয়া সহ রাশিয়ার নানা অংশের ভাষা

মাঞ্চু :
- তুঙ্গুস (Tunguse)
- মাঞ্চু (Manchu)

তুঙ্গুস সাইবেরিয়া অঞ্চলে আর মাঞ্চু চীনের উত্তর পূর্ব মাঞ্চুরিয়ায় বিশেষভাবে প্রচলিত।

৫. ককেশীয় ভাষায় বংশ। এর আধুনিক সময়ের উল্লেখযোগ্য ভাষা জর্জিয়ান (Georgian, জর্জিয়ার ভাষা)।

৬. এসকিমো (Esquimo) ভাষা বংশের অন্তর্গত প্রধান ভাষা হল গ্রিনল্যান্ডের আলেউশিয়ান (Aleutian)।

৭. আমেরিকান আদিম অধিবাসীদের ভাষাবংশ। এগুলি মূলত আটটি উপশাখায় বিভক্ত। যথা :

(১) আলগানকুইয়ান (Algonquian)

(২) আথাবাসকান (Athabascan)

(৩) ইরোকুইয়ান (Iroquoian)

(৪) মুসকোজীয়ান (Muskogean)

(৫) সিওউয়ান (Siouan)

(৬) পিমান (Piman)

(৭) শোশোনীয়ান (Shoshonean)

(৮) নাহুয়াটলান (Nahuatlan)

নাহুয়াটলান ভাষা প্রাচীন আজটেক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করছে। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—'আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষাও ইংরাজী, ফরাসী অথবা স্পেনীয় ভাষার দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে।' ('ভাষার ইতিবৃত্ত', উক্ত; ৮০ পৃ:)। ব্রাজিলে এই তিনটি ইউরোপীয় ভাষা প্রচলিত হয়নি, এখানকার সাধারণ ভাষা পোর্তুগীজ।

বাঙ্ মীমাংসা তথা ভাষাতত্ত্ব (Philology) আসলে প্রাচীন ভাষার অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে। তার লক্ষ্য ভাষার আদিরূপটি আবিষ্কার করার চেষ্টা। সেই রূপটি বোঝা গেলে তা থেকে কেমন করে আধুনিক ভাষাগুলি রূপান্তরিত হচ্ছে তার সন্ধান করে ভাষাতত্ত্ব। ভাষা উৎস, বংশ পরিচয় আর অন্যান্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য। এজন্য কেউ কেউ ভাষাতত্ত্বকে সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান (Cultural Linguistics) অভিহিত করতে চান।

অন্য পক্ষে 'ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics)-এর লক্ষ্য ভাষার গঠন (Structure) আর ক্রিয়া (function)-র আলোচনা। ভাষার যে রূপ ভাষাবিজ্ঞান দেখাতে চায় তা একক, মৌখিক, এককালীন। কী ছিল সেই ইতিহাস ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়—কেমন হয়েছে ভাষার চলমান রূপ, তাকে বুঝে নেওয়াই ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি।

ভাষাবিজ্ঞানের চারটি স্তর লক্ষ করা যায়। যুক্তি কাঠামো গড়ে তোলার এই চারটি স্তর যথাক্রমে : কার্যকারণ বা cause, ফল অর্থাৎ effect, প্রতিক্রিয়া বা reaction আর সাধারণীকরণ বা generalisation. একই ধরনের পরিস্থিতিতে যখন একই রকম ফল দেখা যায়, বিশেষত ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেই কার্যকারণ ও ফল ব্যাখ্যা করতে চায় ভাষাবিজ্ঞান। ক্রমে প্রতিক্রিয়ার একটি সাধারণ ব্যাখ্যা তৈরি হতে থাকে। আর এইভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো বিদ্যায়তনিক অনুমিতি (academic hypothesis) গড়ে ওঠে। দুয়েকটি উদাহরণ নেবার চেষ্টা করছি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিষম যুক্ত ব্যঞ্জন যুক্ত শব্দ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সমীকৃত হয়। রেফ্ চিহ্ন অর্থাৎ র-শব্দের অর্ধব্যঞ্জন ধ্বনি লুপ্ত হয়। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় এই ধ্বনিলোপের জন্য একটি স্বরধ্বনির দীর্ঘতা দেখা যায়। বেশিরভাগ সময় রেফ-পূর্ব স্বরধ্বনি দীর্ঘতা পায়। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এই দীর্ঘতা-স্পষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে বিষম যুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হবার পর যে দ্বিত ধ্বনি তৈরি হয়েছিল তার একটি ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়। যথা :

কর্ম > কম্ম > কাম

চর্ম > চম্ম > চাম

কর্ম ও চর্ম শব্দ দুটি একই ধরনের স্বনিম-যুক্ত। র + ম এই বিষম যুক্তব্যঞ্জন দ্বিতীয় পর্যায়ে ম্ + ম এই সমীকৃত যুক্তব্যঞ্জন আর তৃতীয় পর্যায়ে একটি ব্যঞ্জন-লোপ ঘটল। এই ব্যঞ্জন ধ্বনিটি লুপ্ত হবার পর পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘতা (অ স্থলে 'আ') লক্ষ করা গেল। একে ভাষাবিজ্ঞানেরর সিদ্ধান্ত বা অনুমিতি (academic hypothesis) বলা হয়। একে সূত্রাকারে বলা হয় ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory lengthening)।

অন্য কিছু শব্দযুগ্মে রেফ্ না থাকলেও যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি বিষম ছিল, পরের স্তরে সেগুলি সমীকৃত হয়েছে, তৃতীয় স্তরে সেগুলিরও প্রথম স্বরধ্বনিটির দীর্ঘতা লক্ষ করা যায়। যেমন :

পত্র > পত্ত > পাত → পাতা

ছত্র > ছত্ত > ছাত → ছাতা

এখানে পাত ছাত এর পরও আর একটি স্বরধ্বনির দীর্ঘতা দেখা যাচ্ছে—পাতা ছাতা। পাত পাতা, ছাত ছাতা দুটি শব্দই প্রচলিত। বিশেষ অর্থে এই দুটি শব্দ গড়ে ওঠার কার্য কারণ পূর্ববর্তী ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র (Linguistic Law) দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ভাষাবিজ্ঞানকে নতুন করে কার্যকারণ, ফল, প্রতিক্রিয়া আর ব্যাখ্যানের পর সাধারণীকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction) আর বিদ্যায়তনিক অনুমিতি (academic hypothesis) করতে করতে এগোতে হয়। নতুন নতুন ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র (Linguistic Law) গড়ে তুলতে হয়। বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখার মতোই ভাষাবিজ্ঞান বিদ্যাশৃঙ্খলা (discipline) হিসেবে গড়ে ওঠে এই নিত্যনতুনকে স্বীকার করার প্রগতিশীলতা (Progressiveness) আর সক্রিয়তা (dynamism)-র কারণে।

যে-কোনো সমাজবিজ্ঞানের মতোই সাধারণ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সাধারণ (general) আসে বিশেষ (particular) থেকে। এই বিশেষ কার্যকারণগুলি সাজিয়ে ক্রমশ আরোহ মূলক (inductive) পদ্ধতিতে কখনো অবহোর মূলক (deductive) পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত ও সূত্রে উত্তীর্ণ হওয়া ভাষাবিজ্ঞানের কার্যপদ্ধতি। এদিক থেকে বাঙ্ মীমাংসা বা ভাষাতত্ত্বের তুলনায় ভাষাবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

ভাষাতত্ত্ব আর ভাষাবিজ্ঞান কখনো কখনো একইরকম ক্ষেত্র খুঁজে নিতে পারে। ভাষাতত্ত্ব আলোচনার সীমায় ভাষার বর্তমান স্তরের বিবরণ। তখন তা ভাষাবিজ্ঞানের মতোই সক্রিয়। অতীত স্তরের বিবরণটি দুইভাগে বিভক্ত হতে পারে। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্র সেদিক থেকে এই রকম :

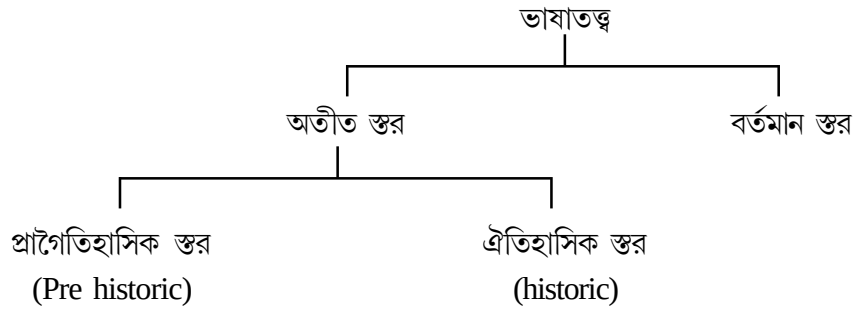

ভাষাবিজ্ঞানও অনুরূপ সন্ধান করতে পারে। একে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান। শব্দ অবলম্বন করে অতীতকে স্পষ্ট করার চেষ্টা হয় এর মাধ্যমে। এর নাম ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাবিজ্ঞান (Linguistic Ontology)। কখনও কোনো জনগোষ্ঠীর অতীত কালটি পুনর্গঠন করার চেষ্টা করে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান—এর নাম জাতিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব (Linguistic Phylogeny)।

৩০১.৩.১০.৫ : ভাষাবিজ্ঞানের দুই শাখা—ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানকে পণ্ডিতেরা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত করতে চান—এককালিক (Synchronic) আর কালক্রমিক (Diachronic)। এককালিক বা Synchronic Linguistics-কে অন্যভাবে বিচার করে বলা হয় বর্ণনামূলক বা Synchronic Linguistics. কালক্রমিক বা Diachronic Linguistics-এর অন্য নাম ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান Historicial Linguistics.

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু কথা ইতিপূর্বে লিখেছি।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে চারলি এফ হকেট তাঁর 'A Course in Modern Linguistics' গ্রন্থে জানিয়েছেন কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (at a given time), ভাষার বৈশিষ্ট্য (design of the language) সমূহের বিশ্লেষণ করতে চায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। কোনো জনগোষ্ঠী (Community)-র ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য সন্ধান ও ব্যাখ্যানই এই ভাষাবিজ্ঞানের শাখাটির মূল লক্ষ্য। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য (interpersonal) কিংবা নানা গোষ্ঠীর পার্থক্য সন্ধান (intergroup differences) এই শাখার আলোচ্য বিষয় নয়।

যখন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ভাষা ব্যবহার, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর পার্থক্য নির্দেশ করতে চায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান—তখন তাকে এককালিক ভাষাবিজ্ঞান (Synchronic Linguistics)-এর বিষয় বলে মনে করেছেন চারলি এফ হকেট। ১৯৬৮-তে লেখা উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন এই ভাষাবিজ্ঞানের শাখা (Synchronic Linguistics)-এর লক্ষ্য : 'the systematic study of inter-personal and inter-group differences of speech habit', অর্থাৎ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের বিধিবদ্ধ আলোচনা। এভাবে এককালিক ভাষাবিজ্ঞান উপভাষাতত্ত্ব (dialectology)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কিছু পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি হল :

১. অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction) : ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে ভাষার ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, শৈলী ও প্রয়োগ-এর রীতি মতো সন্নিবেশ ঘটানো এর লক্ষ্য।

২. বাহ্য পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পদ্ধতি (External Reconstruction or Comparative Method) : প্রাপ্ত তথ্য, উপকরণের বর্গীকরণ ও তুলনা এই রীতির লক্ষ্য।

৩. উপভাষাগত ভূগোল (Dialect Geography) : কোনো নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপভাষা ব্যবহার স্থানিক ও অন্যস্থানের তুলনায় বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা উপভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য। এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক ক্ষেত্র সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

৪. শব্দভাণ্ডারের অবক্ষয় ও নতুন শব্দ সৃষ্টির পরিসংখ্যান (Glotto chronology, Lexico statistics)। এই পদ্ধতির মূল কথা কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডার কেমন করে বদলে যায়—পূর্ববর্তী শব্দগুচ্ছ সরে নতুন শব্দগুচ্ছের প্রচলন হতে থাকে তার বিচার এই পদ্ধতির লক্ষ্য। বস্তুত অভিধানতত্ত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। বিষয়টি অভিধানের শব্দের পরিসংখ্যান নয়—পরিবর্তের ছবিটি বোঝার নিবিড় চেষ্টা। 'পীরিতি' শব্দটি ভাংলা ভাষায় মধ্য যুগে যেমন ছিল এখন তেমন নেই। পীরিতি শব্দটি ধ্বনি পরিবর্তনের দ্বারা পীরিত-এ পরিণত হয়েছে। পীরিত-এর অর্থেরও অবক্ষয় ঘটেছে।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান কী ভাবে তথ্যসঞ্চয় ও বিন্যাস করে? প্রথমেই তাকে বেছে নিতে হবে একটি নির্দিষ্ট কাল পরিধিতে ভাষার কয়েকটি একক বা উপকরণ। এগুলি হচ্ছে এইরকম :

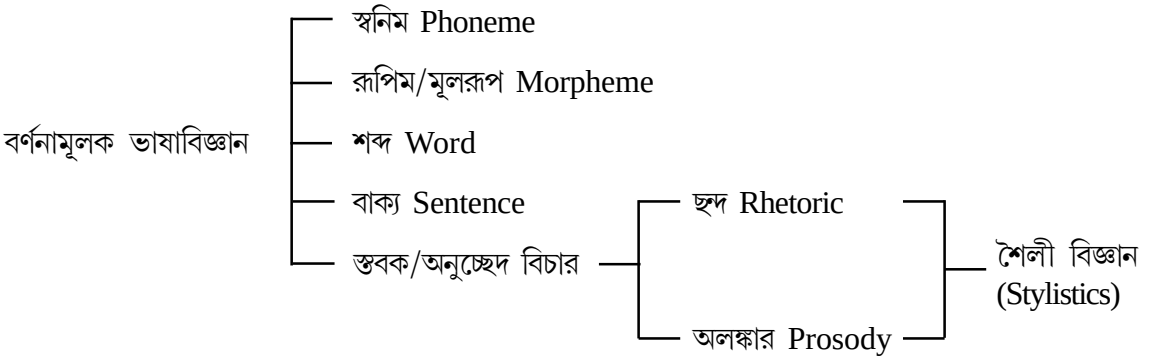

প্রথমে ধ্বনিমূল, স্বনিম (Phoneme)-বিচার, বিন্যাস ও তার তথ্য সঞ্চয় করতে হবে। বাংলা ভাষার মূল ধ্বনিগুলির তালিকা নির্ণয়, উপধ্বনি বা allophone সনাক্ত করতে হবে।

অর্থপূর্ণ মূল সংক্ষিপ্ত রূপ Morpheme. এগুলিকে বিন্যস্ত করলে ভাষার চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট হয়। শব্দ প্রায়ই একটি বা একাধিক Morpheme-এর সম্মিলিত রূপ। কেমন করে, কোনো কোনো যুক্তিতে এই সব Morpheme একত্রিত হচ্ছে শব্দে পরিণত হচ্ছে, তা বুঝে নেওয়া, বিন্যস্ত করা এই পর্যায়ের আলোচ্য।

বাক্যে শব্দ অবিকৃতভাবে থাকে না। বিভক্তি, কারকের চিহ্ন, নানা রকম বিন্যাসের নির্দিষ্ট রীতি মানা না হলে বাক্য তৈরি হয় না। বাক্যের অর্থ প্রকাশ পায় উক্ত রীতিগুলি ঠিকমত মানলে।

ভাষার বাক্য বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না। একসঙ্গে প্রচুর বাক্য পরস্পরিত হয়ে কিছু ভাব বা উপলব্ধির কথা প্রকাশ করা—উপস্থাপিত ও সঞ্চারে করা ভাষার লক্ষ্য। স্তবক বা অনুচ্ছেদ-এর রচনা পদ্ধতি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নতুন একটি ক্ষেত্র তৈরী করেছে—শৈলীবিজ্ঞান তথা Stylistics. এই ক্ষেত্রটি অবশ্য বর্ণনা মূলক ভাষাবিজ্ঞানের সীমাকে অনেক পরিবর্তিত বিস্তৃত করে এনেছে। ভাষার এককালিক (Synchronic) মৌখিকতা (Speech habit) অপেক্ষা Stylistics-এর লক্ষ্য সাহিত্য কর্ম।

রুশ অবয়ববাদী (Structuralist)-রা কবিতার ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছেন ভাষার সাধারণ রীতি পদবিন্যাস অর্থাৎ Syntax-এর নিয়ম ঠিকমতো না মানাই যেন কবিতার লক্ষ্য। ভাষার এই আলঙ্কারিক ছন্দিত প্রকাশরীতি সমাজের মধ্য থেকে উঠে আসে না। ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ বৈশিষ্ট্য বিবৃত করার চেষ্টা করে শৈলীবিজ্ঞান (Stylistics)।

৩০১.৩.১০.৬ : ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা

আধুনিককালে ভাষাবিজ্ঞানের কিছু নতুন শাখার বিকাশ ঘটেছে। যথা :

১. ভৌগোলিক ভাষাবিজ্ঞান (Geolinguistics)

২. অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞান (Structural Linguistics)

৩. অণু ভাষাবিজ্ঞান (Micro Linguistics)

৪. সমাজ ভাষাবিজ্ঞান (Socio Linguistics)

এই বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলি মূলত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

৩০১.৩.১০.৭ : ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক তুলনা

একদিক থেকে দেখলে এই দুই শাখা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একসময় ছিল ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ ভাবার যুগ। হেরমান পাউল মনে করেছিলেন ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ছাড়া ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা অর্থহীন। পরবর্তী সময়ে ভাবা হয়েছে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ছাড়া ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা অপ্রয়োজনীয়—অসম্পূর্ণ। ভাষাবিজ্ঞানী জেলমস্লেভ এইরকম মত প্রকাশ করেন যে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বলে যা আলোচিত হয় তা আসলে ভাষাবিজ্ঞানই নয়—এ হল ইতিহাস আর সমাজতত্ত্বের মিশ্রিত একটি বিচিত্র রূপ।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে এই দুটি বিদ্যাশৃঙ্খলার মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বাদ দিয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে না। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রণালীকে এড়াতে পারে না। ভাষাবিজ্ঞানের এই দুই শাখা পরস্পরিত—এ দুটির মধ্যে বিনিময়ের যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান। এই দুই শাখা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

৩০১.৩.১০.৮ : ভাষার শ্রেণিবিভাগ

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, বাঙ্ মীমাংসা তথা ভাষাতত্ত্ব যেভাবে ভাষার শ্রেণীবিভাগ করেন তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মান আছে। তুলনামূলকভাবে ভাষাগুলিকে দেখতে চান তারা। শেষপর্যন্ত বর্গ বা বংশক্রমে সজ্জা করা হয়। ভাষার শ্রেণিবিভাজনের এই রীতির কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। একে বলতে হয় বংশানুগত শ্রেণি বিশ্লেষণ, Genealogical Classification.

এর সঙ্গে ভাষা মানচিত্র রচনা—ভাষার এক স্থান থেকে অন্যভাবে যাত্রা তার ফলাফল প্রভৃতি বিষয়কেও ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত করা সম্ভব। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। পূর্বী হিন্দী বা ভোজপুরী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী সস্তা শ্রমিক হিসেবে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর তাদের ভাষা ব্যবহার যৎকিঞ্চিৎ বদলালেও মূল রূপটি প্রায় অবিকৃত আছে। ফলে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—ত্রিনিদাদ বা সুরিনাম, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ মরিশাস, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ফিজি—সর্বত্রই ভোজপুরী ভাষার বিকাশ লক্ষ করা যায়। আফ্রিকার জনগোষ্ঠীগুলি মার্কিন দেশে নিজেদের ভাষা ব্যবহারকে রক্ষা করতে পারেনি। ভাষার অন্তর্গত উপভাষাগুলির বিচার ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক শ্রেণিবিভাজনের রীতির প্রচলিত বৈশিষ্ট্যগুলি সন্ধান ও বিন্যাস করা হয়। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন : 'ভাষা-বিভাজনের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে মোটামুটিভাবে ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে তালিকা করা। ইহাকে বলে ভৌগোলিক শ্রেণিবিভাগ (Geographical Classification)।' (ভাষার ইতিবৃত্ত; ৭৬ পৃ:)। তিনি অবশ্য এই শ্রেণিবিভাগকে খুব গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর মতে—এই 'শ্রেণিবিভাগের কোনো অতিরিক্ত উপযোগিতা নাই', নেই কোনো বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য। এর সামান্য 'ঐতিহাসিক মূল্য' তিনি স্বীকার করেছেন কেবল।

ফার্দিনান্দ দে স্যেসুরে 'geographical diversity'-কে খুব অযৌক্তিক, উপযোগিতাহীন বলে ধরেন নি। নানা গোষ্ঠীর ভাষা কেমন করে এক একটি অঞ্চলে পাশাপাশি এসে পড়ে—তা কেবল ঐতিহাসিক নয় ভৌগোলিক ভাষা-বিজ্ঞানের রীতিতে বিবেচনার যোগ্যও বটে। স্যেসুরে লিখেছেন : 'newcomers may superimpose their language on the in digenous language. For instance, in South Africa, two successive colonizations introduced Dutch and English, which now exist alongside several Nergo dialects' (Courses in general Linguistics; উক্ত; 194 পৃ:)। একইভাবে মেক্সিকোতে স্প্যানিশ আর স্থানীয় ভাষাগুলি সহাবস্থান করে। শেষ পর্যন্ত স্যেসুরে 'unbroken chain of linguistic zones'-কে

গুরুত্ব দিয়েছেন, দেখিয়েছেন ভাষার মধ্যে কেমন করে provincialism বিকশিত হয়। উপভাষা থেকে ভাষার বিকাশ ঘটে। এ সমস্ত কেবল মূল্যহীন আলোচনা নয়।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে ব্যাকরণের মান অনুযায়ী রূপতাত্ত্বিক শ্রেণি বিশ্লেষণ করে ভাষার শ্রেণিবিভাগ করে—একে বলতে হয় Morphological Classification. ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দের রূপান্তরিত হওয়া বিন্যাসভেদে অর্থান্তর ঘটা প্রভৃতি বিষয়ে এরা ভাষার শ্রেণিবিভাগ করার পক্ষপাতী। এই বিভাজন রীতিতে এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাস ঘটা সম্ভব। যথা :

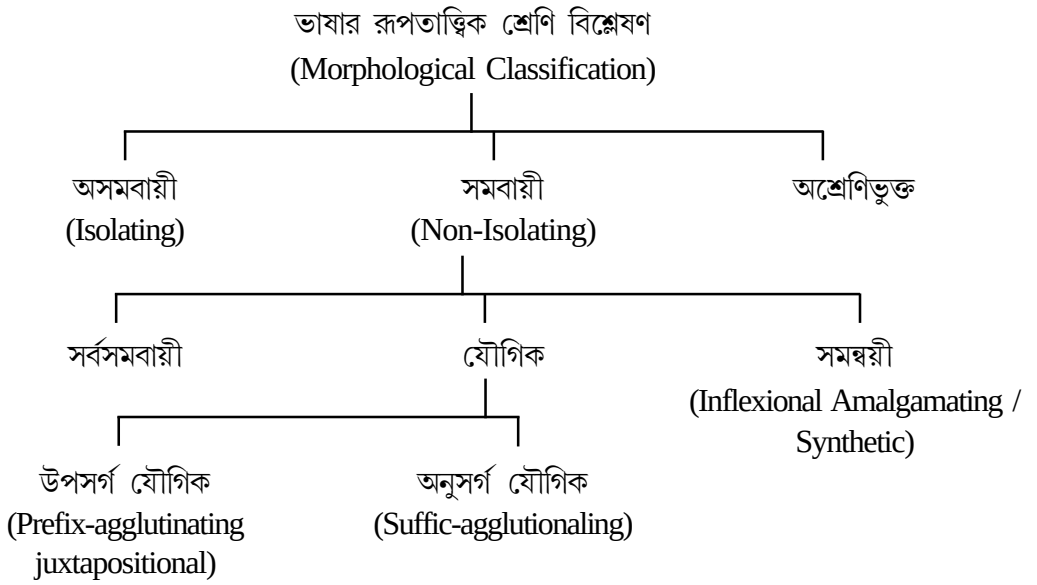

যে ভাষাগুলির শব্দ নির্বিকার, কেবল শব্দসজ্জার উপর নির্ভর করে ভাববিন্যাস বা প্রকাশের তারতম্য সেই ভাষার শ্রেণী অসমবায়ী বা Isolating—চীনা ভাষা এই রীতির। ভাষাটিতে শব্দের পরিবর্তন হয় না। তবে সুর বা tone-এর তারতম্য আছে। বস্তুত সুরের তারতম্যেই চীনা ভাষার ভাব ব্যক্ত হয়।

সর্বসমবায়ী ভাষার ক্ষেত্রে বাক্য শব্দ একাকার। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাগুলিকে এই পর্যায়ে আলোচনা করা সম্ভব।

কিছু ভাষার শব্দে উপসর্গ যোগ করে নতুন নতুন অর্থ তৈরি করা যায় কোনো কোনো ভাষায় অনুসর্গ যোগ করে অর্থ তাৎপর্যের পার্থক্য বৈচিত্র্য সৃজন সম্ভব। কোনো ভাষা আবার অনুসর্গ, উপসর্গ ছাড়াও নতুন নতুন উপাদানে শব্দের রূপান্তর ঘটিয়ে ভাষ্য বদলে যায়।

এক আধটি ভাষাকে এগুলির কোনো বর্গ বা শ্রেণিতেই ফেলা যায় না। যেমন জাপানী ভাষা।

ড. সুকুমার সেন উপসর্গ-যৌগিক ভাষার উদাহরণ হিসেবে মধ্য আফ্রিকার বান্টু ভাষার কথা বলেছেন। অনুসর্গ-যৌগিক ভাষার উদাহরণ হিসেবে তামিল আর সমন্বয়ী ভাষার উদাহরণ হিসেবে আরবী এবং সংস্কৃত ভাষাকে ধরতে চান। অনুসর্গ-উপসর্গ agglutination-কে স্যেসুরে ইচ্ছাকৃত বা সক্রিয় বলে মানেন নি—তাঁর মতে 'agglutination is neither willful nor active' ('Course in general Linguistics', উক্ত 1977 পৃ:)। একে নিছক যান্ত্রিক (mechanical) কিংবা স্বতোৎসারিত (takes place spontaneously) বলে মনে করেছেন। ভাষার এই বিবেচনায় ভাষা এককালিক হলেও ঐতিহ্য সম্মত বলে প্রতিভাত হয়।

৩০১.৩.১০.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ভাষাকে প্রতীকের নির্মাণ ও বিনির্মাণ বলার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

২। ভাষা কাকে বলে? ভাষার কোনো সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিনা—দেখান।

৩। ভাষাকে চিহ্নায়ন বলার কারণটি বিশ্লেষণ করুন।

৪। ভাষার শব্দ আর অর্থের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট যৌক্তিক সম্পর্ক রাখা যায় কিনা বিচার করুন।

৫। ভাষা উদ্ভবের ক্ষেত্রে যে তত্ত্বগুলি বিকশিত হয়েছে তার পরিচয় প্রদান করুন।

৬। ধাতুরূপ বদলের ক্ষেত্রে গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণের বৈশিষ্ট্যগুলির উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭। আপতিক বা আকস্মিকতার তত্ত্ব (Anomalist theory) আর সাদৃশ্য সন্ধান তত্ত্ব (Theory of Analogy)-বলতে কী বোঝায় আলোচনা করুন।

৮। বিধিনির্দেশ তত্ত্ব (Theory of System বা Manner) বলতে কী বোঝায়, আলোচনা করুন।

৯। ভাষা উদ্ভবের ক্ষেত্রে সামাজিক উপযোগিতার তত্ত্ব (Theory of Social utility) বলতে কী বোঝায় আলোচনা করুন।

১০। ভাষার ব্যাকরণ, বাঙ্ মীমাংসা বা ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞান-এর সংজ্ঞাদান করুন, পার্থক্য বিচার করুন।

১১। ব্যাকরণের মধ্যে ভাষা পরিকল্পনা (Language Planning)-র উপাদান মেলা সম্ভব কিনা আলোচনা করুন।

১২। ব্যাকরণ ক' রকম হতে পারে? Normative Grammar, Positive Grammar আর Prescriptive Grammar বলতে কী বোঝায়?

১৩। ব্যাকরণের বিষয় কী কী হতে পারে—আলোচনা করুন।

১৪। ধ্বনিতত্ত্ব কাকে বলে? ধ্বনিতত্ত্বের অংশগুলি কী কী—আলোচনা করুন।

১৫। ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ করুন।

১৬। ধ্বনিতত্ত্ব আর ধ্বনিবিচার—Phonetics আর Phonemics-এর মিশ্রিত বিচারই ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonology)—মতটি সমর্থন করা যায়?

১৭। পূরক স্বন বা Allophone বলতে কী বোঝায়?

১৮। মূল ধ্বনি বা স্বনিম (Phoneme) বলতে কী বোঝায়?

১৯। মূল রূপ বা রূপিম (Morpheme) হল ভাষার সংক্ষিপ্ততম অর্থযুক্ত রূপ—আলোচনা করুন।

২০। বাক্যতত্ত্ব কাকে বলে? বিশ্লেষণ করুন।

২১। রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বকে পৃথক ভাবে আলোচনা করতে চান না কেউ কেউ। তাঁদের মতামত স্পষ্ট করুন।

২২। শব্দার্থ তত্ত্ব বলতে কী বোঝায় আলোচনা করুন।

২৩। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাধারণ পরিচয় দিন।

২৪। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাধারণ পরিচয় বাঙ্গালা ভাষার স্থান নির্ণয় করুন।

২৫। অস্ট্রিক বা দক্ষিণ দেশীয় ভাষাগোষ্ঠীগুলির সাধারণ পরিচয় প্রদান করুন।

২৬। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলির সাধারণ পরিচয় প্রদান করুন।

২৭। ভোট চিন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলির পরিচয় প্রদান করুন।

২৮। সেমীয়-হামীয়, বান্টু, ফিন্নো-উগ্রীয়, তুর্ক-মঙ্গোল মাঞ্চু ভাষাগোষ্ঠীর বিবরণ প্রদান করুন।

২৯। ককেশীয়, এসকিমো, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাবংশগুলির সাধ্যমত পরিচয় প্রদান করুন।

৩০। বাঙ্ মীমাংসা বা ভাষাতত্ত্বকে কী কারণে সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান (Cultural Linguistics) বলা যায়?

৩১। ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে চারটি স্তর—এগুলির পরিচয় দিন।

৩২। ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা পদ্ধতির দ্বারা সারস্বত অনুমিতি গড়ে তোলেন, কী ভাবে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩৩। ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন বলতে কী বোঝায়?

৩৪। ভাষাবিজ্ঞানকে প্রগতিশীল ও সক্রিয় বিদ্যাশৃঙ্খলা বলার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৩৫। বাঙ্ মীমাংসার চেয়ে কি কি কারণে ভাষাবিজ্ঞান অনেক বেশি বিজ্ঞানধর্মী?

৩৬। ভাষাতত্ত্ব ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কীভাবে অতীত ও বর্তমান স্তরকে সমান গুরুত্ব প্রদান করতে পারে?

৩৭। ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাবিজ্ঞান (Linguistic Ontology) আর জাতিবৃত্তীয় ভাষাবিজ্ঞান (Linguistic Phylogemy) বলতে কী বোঝায়?

৩৮। ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়?

৩৯। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি কি হতে পারে—আলোচনা করুন।

৪০। এককালিক ভাষাবিজ্ঞান কীভাবে উপভাষাতত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে—আলোচনা করুন।

৪১। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করুন।

৪২। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উপকরণ বিচার করা। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান কেমন করে শৈলী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে?

৪৩। ভাষাবিজ্ঞান থেকে আধুনিক সময়ে যে সব নতুন নতুন শাখা তৈরি হয়েছে তার পরিচয় দিন।

৪৪। ভাষাবিজ্ঞানের দুই শাখা—ঐতিহাসিক আর বর্ণনামূলক; এই দুই শাখার সম্পর্ক ও তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪৫। ভাষার শ্রেণিবিভাগ বলতে কী বোঝায়?

৪৬। ভাষার ভৌগোলিক শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন ও ফার্দিনান্দ দে স্যোসুরের মতামত স্পষ্ট করুন।

৪৭। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে ভাষার শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৪৮। অনুসর্গ উপসর্গ সম্পর্কে স্যোসুরের মতটি জানান।

৪৯। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন : (ক) সুর বা tone (খ) Provintialism

৫০। রুশ অবয়বাদীদের চিন্তা শৈলীবিজ্ঞানে কীভাবে সাহায্য করেছে?

৩০১.৩.১০.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ড. রামেশ্বর শ' : 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

২। Ferdinand de Saussure : 'Course in General Linguistics', Mcgraw Hill Book Company, New York, Toronto, London, Wade Baskin - কর্তৃক অনূদিত। 1966. মূল বই, জুলাই ১৯১৫।

৩। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৫০।

৪। ড. সুকুমার সেন : 'ভাষার ইতিবৃত্ত'; ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৯৭৯।

৫। Sally Wehmeier : 'Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English'; Oxford University Press; ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০০।

৬। ড. মনসুর মুসা : 'ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ'; মুক্তধারা ঢাকা; ১৯৮৪।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১১

তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৩.১১.১ : তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পটভূমি

৩০১.৩.১১.২ : ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা

৩০১.৩.১১.৩ : পাশ্চাত্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা

৩০১.৩.১১.৪ : গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব

৩০১.৩.১১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৩.১১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.৩.১১.১ : তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পটভূমি

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ইংরেজি নাম 'Comparative Linguitics'. নাম শুনেই বোঝা যায়, এই ভাষাতত্ত্বে একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করা হয়। অর্থাৎ একাধিক প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনা করে তাদের সঠিক সম্পর্ক নির্ণয় করাই এই ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। এককথায়, যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনা করে সেই ভাষার জন্ম-উৎসের ইতিহাস নির্ণয় করা হয়—তাই-ই হল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। তাই তুলনামূলক ভাষার বিজ্ঞানে তুলনা করার জন্য একাধিক ভাষার প্রয়োজন হয়, যেমন বাংলা ভাষার কোনো শব্দ বা বাক্যের আদিরূপ নির্ণয় করতে হলে অসমিয়া, ওড়িয়া বা হিন্দির প্রসঙ্গ যেমন আসতে পারে—তেমনি ইংরেজি বা চিনা ভাষার প্রসঙ্গও এসে যেতে পারে। এইভাবে একাধিক ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, তারা আলাদা আলাদা ভাষাবংশে হলেও মূলত একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ভারতেই প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাত হয়েছে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'Royal Asiatic Society'-র সভাপতি স্যার উইলিয়াম জোনস (William Jones) এক বক্তৃতাতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রসঙ্গ আনেন। কিন্তু এই ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা এর পটভূমি হিসেবে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

ক. নানা দেশ ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক অভিযান।

খ. তুর্কিদের কন্সট্যান্টিনোপল অধিকার।

গ. মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

ঘ. মিশনারীদের ধর্মপ্রচার।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের (১৯৪২) পর পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং একাধিক ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ফলে প্রাচ্যের সঙ্গে প্রাশ্চাত্যের ভাস্কো-দা-গামার আগমনের প্রভাব সূদরপ্রসারী। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ম্যাকমিলান বলেছেন—

> "perhaps no event during the middle ages hed such for reaching reprecussions on the civiliged world as the opening of the sea route to India."

প্রকৃতপক্ষে এই নতুন পথটি আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে নবজাগরণ ঘটে, অন্যদিকে ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে ইউরোপীয়রা অবহিত হয়ে ওঠে। এবং তাদের তুলনামূলক ভাষা অধ্যয়নে স্থান পায় সংস্কৃত ভাষা। রোমানরা গ্রিস অধিকার করার পর কন্সট্যান্টিনোপলই গ্রিক পণ্ডিতদের বিদ্যাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তুর্কিরা যখন কন্সট্যান্টিনোপল দখল করে তখন সেখানকার গ্রিক ও রোমান পণ্ডিতরা ইতালিতে আশ্রয় নেয়। ফলে ইতালি গ্রিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। ইতালি শিল্প সাহিত্য চর্চায় গ্রিক ও রোমানদের থেকে দূরে থাকলেও শিল্পের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল। তাই তারা গ্রিক ও ল্যাটিন শিল্পসাহিত্য গ্রহণ করেন। এর ফলে পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে নবজাগরণ দেখা যায়। এই সময় গ্রিস, ইতালি, রোমের মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে।

জার্মানিতে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন দেশের ভাষার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। মুদ্রিত হবার ফলে মানুষের হাতে আসে। এতে বিভিন্ন ভাষার মানুষ তাদের ভাষার সাথে অন্য দেশের ভাষার তুলনামূলক চর্চার সুযোগ পায়। তাহলে, পাশ্চাত্য দেশে নবজাগরণের যুগে যে ভৌগোলিক অভিযান শুরু হল এবং মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হল তার ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এতে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পার্থক্য ও সাদৃশ্য যতই ধরা পড়তে থাকে ততই ভাষাবিদদের মধ্যে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে শুরু করে।

১২০২-০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণের সময় মঠ মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রভাব দেখা যায় ধীরে ধীরে। খ্রিস্টান মিশনারীরা এই সময় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাইবেলের অনুবাদ করে বিভিন্ন ভাষায় এবং তা পৌঁছে দেয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে। এতে বিভিন্ন দেশের মানুষ শুধুমাত্র ধর্ম নয়, তুলনামূলক ভাষাচর্চায়ও আগ্রহী হয়ে ওঠে।

আগেই বলা হয়েছে স্যার উইলিয়াম জোনস কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বক্তৃতা দেন তাতেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয়। কারণ এই বক্তৃতায় তিনি লাতিন, গথিক, কেলতিক, প্রাচীন পারসিক, আবেস্তীয় প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্যের সূত্রটি প্রথম ধরিয়ে দেন। অবশেষে আলোচনার মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই সমস্ত ভাষা একটিমাত্র ভাষাবংশ থেকে জন্মলাভ করেছে। সেই ভাষাবংশ হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। পরবর্তীকালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষকরা উইলিয়াম জোনসের এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেন। যদিও আগেই স্পেনীয় ইহুদি ইব্‌ন্ বারুন্ আরবি ও হিব্রু ভাষায় তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন, তবুও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাত হয় নবজাগরণ সূচিত হবারও প্রায় তিন শতাব্দী পরে জোনসের হাত ধরে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রাচীন নাম ছিল সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জোনস কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন। জার্মান মনীষী হের্ডার, হুমবোল্ট, গ্যেটে এবং শিলার শকুন্তলা পাঠে মুগ্ধ হন। এবং তাঁদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বোধ জাগ্রত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ওই মনীষীরা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ভারতের মাটিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই ধারার বিকাশ হয়েছিল জার্মানিতে। জার্মান পণ্ডিত শ্লেগেল এ ব্যাপারে ভূমিকা নেন। তিনি পৃথিবীর ভাষাগুলোর তুলনা করে তার উৎস, ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করেন। 'On the Language and Wisdom of the Indians' গ্রন্থে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূলনীতি প্রয়োগ করেন। এখানে বিভিন্ন ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠনের তুলনা করে তাদের বংশগত অভিন্ন উৎসের নির্দেশ শ্লেগেল দিয়েছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "The work is considered the first attempt at Indo-Germanic linguistics and the starting point at the study of Indian languages and comparative philology."

শ্লেগেলের নেতৃত্বেই আনুষ্ঠানিকভাবে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা শুরু হয়। অবশ্য পরবর্তীতে রাস্ক, বফ, গ্রীম, হের্ডার, হুমবোল্ট প্রমুখ মনীষী তুলনামূলক ভাষাচর্চার পথকে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান।

৩০১.৩.১১.২ : ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ভাষার প্রচলন আছে। এই ভাষাগুলিকে যে ছ-টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে ভাষার আদি, উৎস, বংশ নির্ণয় এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপরেখা চিত্রিত করা হয়। এই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রাচীন নাম ছিল 'সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব' (Philological linguistics)। এই ধারার প্রথম সূচনা হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে। এই সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের মধ্যে একাধিক প্রাচীন ভাষার মধ্যে তুলনা করে তাদের জন্ম, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের যে রূপরেখা অঙ্কন করা হত আধুনিককালে তা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে পরিগণিত হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আধুনিককালে শুধু প্রাচীন নয় আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যেও তুলনা করা হয়। ভারতে প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয় এবং তার সূত্রপাত করেন স্যার উইলিয়াম জোনস। তিনি কলকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হয়েছিল—

> "The Sanskrit language, whatever be its antiquity is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquistitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed, that no philologer could examine then all three, with out believing them to have sprung from some common source, which perhaps, no longer exists. There is a similiar reason, though notquite so forcible, for supposing that both the Gothic and Celtic, though blended with a different idiom, had the same origin with the Sanskrit; and the old persian might be added to the same family."

এর তিনবছর পর জোনস কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন। এর ফলে কালিদাসের নাটকের প্রতি ইউরোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এরপর জার্মান মনীষী হের্ডার, হুমবোল্ট, গ্যেটে ও শিলার শকুন্তলার পাঠে মুগ্ধ হন এবং শকুন্তলা সম্পর্কে নানা প্রশংসা করেন।

ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস ঘাটলে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের আগেও কিন্তু স্পেনীয় ইহুদি ইবন বারুনের ভাষাতত্ত্ব আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আরবি ও হিব্রু ভাষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে গ্রন্থ লিখেছিলেন। তবে শুধুমাত্র তুলনা করেন, কোনো ভাষার জন্ম উৎসের নির্দেশ দেননি। এই কারণে স্যার উইলিয়াম জোনসকেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার প্রতিষ্ঠাতা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়।

ভারতবর্ষের মাটিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা হলেও এই ধারার বিকাশ ঘটে জার্মানিতে। এখানে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা করেন ফ্রীদ্রিশ শ্লেগেল। এই ধারা অব্যাহত রাখেন হুমবোল্ট, র‍্যাসসুস ক্রিস্টিয়ান রাস্ক, ফ্রান্‌ৎস বপ্, য়্যাকপ গ্রীম প্রমুখ।

৩০১.৩.১১.৩ : পাশ্চাত্যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা

১৭৮৬ তে স্যার উইলিয়াম জোনসের হাত ধরে যে নতুন ভাবে ভাষাতত্ত্বচর্চার শুরু হয়েছিল, তার ফলে জার্মানিতেও ভাষাতত্ত্বচর্চা শুরু হয়।

শ্লেগেল :

তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। জার্মানিতে শ্লেগেলই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বীজ বোনেন। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তুলনামূলক ব্যাকরণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যাকরণ শব্দটি শ্লেগেলের কাছ থেকেই পাওয়া যায়।

শ্লেগেল সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Language and Wisdom of the Indians'.। এখানে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূলনীতি প্রবর্তন করেন। তিনি এখানে বিভিন্ন ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠনের তুলনা করে তাদের বংশগত অভিন্ন উৎসের নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু উৎস নয়—একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করে তাদের ভিতরের ব্যাকরণগত সাদৃশ্য বের করে ভাষাগুলির মধ্যে ঐক্য নির্ণয় যে সম্ভব সে কথাও তিনি বলেছেন। এই কারণেই গ্রন্থটির অপরিসীম গুরুত্ব আছে। বিশিষ্ট সমালোচক তাঁর গ্রন্থটির গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন—

> "The work is considered the first attempt at Indo-Germanic Linguistics and the starting point of the study of Indian Languages and comparative philology."

হুমবোল্ট :

শ্লেগেলের প্রায় সমসাময়িক ভাষাবিজ্ঞানী হলেন হুমবোল্ট। অনেকে তাঁকেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন। তবে এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ শ্লেগেলই জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তবে হুমবোল্ট মালয় পলিনেসীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন বলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে তাঁর অবদান স্মরণীয়। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানেও তিনি প্রথম ভাষার মনস্তাত্ত্বিক দিকটার কথা বলেছেন। এ ছাড়া বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাষার বর্গীকরণও করেছিলেন। আর ভাষার মনোগত দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন বলেই, তাঁকে মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের পথিকৃৎ বলা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে হুমবোল্ট অবহেলার পাত্র ছিলেন না।

ফ্র্যানৎস বপ্ :

শ্লেগেলের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকে পর্যাপ্ত দৃষ্টান্তসহ তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ আলোচনার রূপদান করেন যে তিনজন ভাষাতত্ত্ববিদ্, তাঁদের অন্যতম হলেন ফ্রানৎস বপ্। তিনি ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক, লাতিন, পারসিক, জার্মানিক, লিথুয়ানীয়—প্রভৃতি ভাষার একটি তুলনামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রিক, লাতিন, পারসিক ও জার্মানিক ভাষার সঙ্গে তুলনা করে সংস্কৃতের ক্রিয়ারূপ নিয়ে গঠিত গ্রন্থটির নাম 'উয়েবর্ দাম্ কোন্‌য়ুগাৎসিওন্স জিস্‌টেমদ্যের জানাস্ক্রিট স্প্রাখে ইন ফ্যেরগ্লাইশুং সিট্

য়েনেস্দ্যের গ্রীশিশেন লাটাইনিশেন্। প্যেরজিশেন্ উন্ট্ গ্যের্মানিশেন্ স্প্রাখে।' এটি তুলনামূলক ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ রচনা। তবে এখানে তিনি ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষা সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, লিথুয়ানীয়, গথিক ও জার্মান ভাষার তুলনা করে আর একটি গ্রন্থ লেখেন, যার নাম 'ফ্যেরগ্লাইশেন্ডে গ্রামাটিক দেস্ জান্স্ক্রিট্ জেন্দ, গ্রীশিশেন্ লাটাইনিশেন্, গোটিশেন্উন্ট ভয়টশেন্'।

র‍্যাসসুস ক্রিস্টিয়ান রাস্ক :

রাস্ক জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি হল 'উনদ্যের স্যেগেল্সে অম্ দ্যে গাম্লে নরদিস্কে এলের ইস্লান্দস্কে স্প্রোক্ ওপ্রিন্দেলসে'। এখানে তিনি টিউটনিক শাখার ভাষার ধ্বনির মধ্যে একটি নিয়মিত বিধিবদ্ধ পার্থক্যকে প্রথম স্পষ্ট করে দেখালেন। তিনি এখানে বলেছেন যে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্যান্য শাখায় ভাষায় যেখানে 'প' (p) হয়, সেখানে টিউটনিক শাখায় ভাষায় উষ্ম 'ফ' (f) হয়। এ ছাড়া তিনি আবেস্তার পুঁথি সংগ্রহ করে তার ভাষাকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্দের সামনে তুলে ধরেন। ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার কিছু মূল উপাদান এখানে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাচীন নর্স ও প্রাচীন ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'ফেয়লেৎনিং তিল দ্যেৎ ইস্লান্দ্স্কে এলের গাম্লে নর্দিস্কে স্প্রোর'।

য়াকপ গ্রীম :

রাস্কের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ধ্বনি পরিবর্তনের আলোচনা আরও এগিয়ে নিয়ে যান য়াকপ্ গ্রীম। রাস্কের তথ্যকে তিনি যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন। গ্রীম এই ধ্বনিকে নাম দেন জার্মানিক ধ্বনি পরিবর্তন। এটি পরবর্তীতে 'গ্রীমের সূত্র' নামেই খ্যাত হয়। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান ব্যাকরণ 'ডয়ট্শে গ্রামাটিক' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি জার্মানিক বা টিউটনিক শাখার ভাষা গথিক, স্ক্যান্ডিনেভীয়, ইংরেজি, ফ্রীজীয়, ওলন্দাজ ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্করণে তিনি ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম ব্যাখ্যা করেন এবং মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেন। যথা—

অ. মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শ ধ্বনি জার্মানিক ভাষায় মহাপ্রাণ অঘোষ উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 'প' (p) হয়েছে 'ফ' (f).

আ. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ঘোষবৎ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি শাখায় ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যথা—

মূল ইন্দো-ইউরোপীয়	জার্মানিক
bh	= b
dh	= d
gh	= g

ই. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক শাখায় অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— p; t; k, k^w > f; o; x, x^w

তবে গ্রীমের এই সূত্র সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর গ্রীম এই সূত্রের মধ্যে নিজের এটি দেখতে পান। পরবর্তীতে তাই এই সূত্রের পূর্ণরূপ দেখতে পাওয়া যায় পরবর্তীকালের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ের মধ্যে।

স্যাডল্ফ কার্ল ভের্নার :

গ্রীমের সূত্রে যে ঘাটতি ছিল তা পূর্ণ করেন স্যাডল্ফ কার্ল ভের্নার। তিনি গ্রীমের সূত্র নতুন ভাবে বিধিবদ্ধ করেন। ফলে তাঁর সূত্রের নাম হয় 'ভের্নার-এর সূত্র'। এই সূত্রে ভের্নার ধ্বনি পরিবর্তনের ধারাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—৫০০ খ্রিস্টাব্দে পূর্বাব্দের ধ্বনি পরিবর্তন ও খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর ধ্বনি পরিবর্তন। প্রথম প্রকারের ধ্বনি পরিবর্তনের তিনি নাম দিয়েছেন প্রথম ধ্বনি পরিবর্তন ও দ্বিতীয় প্রকারের নাম দিয়েছেন দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তন। তিনি বলেছেন ধ্বনি পরিবর্তন মূলত দুই ভাবে হয় । যথা—

ক. পশ্চিম জার্মানিক ভাষায় স্বরপরবর্তী পদমধ্যস্থ বা পদান্তিক স্পর্শধ্বনি (p) জার্মানিক উপশাখায় দ্বিত্ব হয়ে উষ্মধ্বনি হয়েছে।

খ. শব্দের আদিতে, মধ্যে ও শেষে এবং দ্বিত্ব প্রাপ্ত অবস্থায় পশ্চিম জার্মানিক শাখার (p) উপশাখায় এসে ঘৃষ্ট ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

আউগুস্ট ফ্রিদ্রিস পট :

ভাষার ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে ফ্রিদ্রিস পটের ভূমিকা অপরিসীম। তাই তাঁকে অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রের জনক অভিধা দিয়েছেন। তিনি শব্দের প্রাচীনতম রূপটির আলোচনা যেমন করেছেন, তেমনি সেই রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাষার রূপ নিয়েও আলোচনা করেন। এই তত্ত্ব তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ছাড়াও তিনি তুলনামূলক ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়েও আলোচনা করেন এবং ইন্দো-ইউরোপের ভাষাসমূহের ধ্বনির একটি তালিকা করে দেন।

আউগুস্ট শ্লাইগার :

এ ক্ষেত্রে শ্লাইগারের অবদানও যথেষ্ট। তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ লেখেন, যার নাম 'কমপেন্ডিউস্‌ দ্যের ফ্যেরগ্লাইশেনডেন্‌ গ্রামাটিক দ্যের ইণ্ডো-গ্যেরমানিশেন্‌ স্প্রাখে।' এই গ্রন্থে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে একটি নতুন তথ্য দেন। কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে একে একে বিভিন্ন ভাষাবংশের উদ্ভবকে তিনি গাছ ও তার শাখাপ্রশাখার মতো করে এঁকেছিলেন। আর তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের চিত্র আঁকেন।

কার্ল ব্রুগম্যান :

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে ব্রুগম্যানের অবদান অপরিসীম। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'গ্রন্ড্রিশ দ্যের ফ্যেরগ্লাইশেন্ডেন গ্রামাটিক দ্যের ইন্ডোগ্যেরমানিশেন্ স্প্রাখ্যেন'। গ্রন্থটি ডেলব্রুকের সহায়তায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি তুলনামূলক দৃষ্টিতে আইরিশ, বুলগারীয়, জার্মানিক, গথিক, লিথুয়ানীয় প্রভৃতি ভাষার মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে এই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ্ তুলনামূলক গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন এবং নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করতে থাকেন। সুতরাং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ।

৩০১.৩.১১.৪ : গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত হয় ইউরোপ ও আমেরিকায় ১৯৩০ সালে বা তার আগে। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে প্রথমে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হত। তবে পরবর্তীতে ভাষার ক্রিয়াগত দিকও পুনর্বিচার করা হয়। ভাষার সামাজিক ক্রিয়া এবং ঐতিহাসিক বা সমকালীন ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের একটা পার্থক্যও টেনে দেওয়া হয় এই ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে। প্রথমে ইউরোপে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস আলোচনা করা হল।

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার প্রথম প্রবক্তা হলেন ফার্দিনান্দ দ্য সসিউর। তিনি ভাষার গঠনগত দিকের কথা ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়েই বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে—

> "Language is a system, and sould be studied as such: individual facts should not be taken in isoloation, but always as a while, takling into accouts that every detail is determined by its place within the system. Language is primarily a social phonomenon which serves the purpose of mutual understanding, and ought to be studied as such the correction of should and meaning should always be borne in mind, since it is of crucial importance in the process of communiciation. The evolution of language and its actual state are two fundamentally different phonomena, from the point of view of method it is inadmissable to bring historical criteria into the interpretation of the present state of language."

এই বক্তব্যে ভাষার গঠনগত দিকটিও চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

ইউরোপে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা :

ইউরোপে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে তিনটি ধারা বা পর্যায় লক্ষ করা যায়। যথা—

ক. জেনেভা

খ. প্রাগদল

গ. গ্লস মেটিসিয়ান দল।

ইউরোপের জেনেভা দল গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দলটি সসিউরের ধ্রুপদী ধারা অনুসরণ করেছিল। সেইসময় এঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও বর্তমানে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে কোনো অবদান নেই।

প্রাগদলে অনেক খ্যাতনামা শ্লাভ ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন। আপেক্ষক ভাষাতত্ত্বচর্চা করে এই দলটি। ধ্বনিরূপ কিভাবে যোগাযোগের চিহ্ন হিসেবে ক্রিয়াশীল তা তাঁরা আলোচনা করেন। ধ্বনিগত সমস্যাও তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল। দলটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। এমনকী ধ্বনিতাত্ত্বিক দলরূপেও চিহ্নিত হয়েছিল এই প্রাগ দলটি।

ইউরোপে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার তৃতীয় ধারাটি অনুসৃত হয় গ্লসমেটিসিয়ান দলের দ্বারা। কেউ কেউ এই দলটিকে নিও-সসিউরিয়ানইজম হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন। নির্বস্তুকের প্রতি এঁদের প্রচণ্ড আসক্তি ছিল। সসিউরের ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নের সঙ্গে দলটির বিশাল সাদৃশ্য ছিল। এমনকী বর্তমানে দলটি ভাষাচিহ্নের সাধারণ একটি সূত্র গঠনে প্রয়াসী। তবে বস্তুবাচক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে এই দলটি আগ্রহী নয়।

আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা :

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপের ভাষাতাত্ত্বিকরা কিন্তু সসিউরকে পুরোপুরি মেনে নেননি। তাঁরা মৌল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বের গঠনগত দিকটি বর্ণনা করলেও পদ্ধতিগত ধারণার সঙ্গে মতানৈক্য ছিল ইউরোপের বা ফার্দিনান্দ সসিউরের ভাষাতত্ত্বের আলোচনা। আমেরিকায় সপির ও ব্লুমফিল্ড গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। সসিউরের সঙ্গে আমেরিকার ভাষাতাত্ত্বিকদের বিরোধিতাও ছিল। যেমন সসিউরের মতে ভাষামনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার এবং ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন মানুষের মধ্যে নির্বস্তুক সত্তারূপে অবস্থান করে। কিন্তু আমেরিকার ভাষাতাত্ত্বিকরা বলেন—ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার রূপটি স্পষ্টভাবে নির্দেশমত ও ভাষার গঠনরূপের মাধ্যমে ভাষা যারা ব্যবহার করবেন, তাদের ভাষাতাত্ত্বিক সচেতনতা আসবে। ব্লুমফিল্ডের মতে ভাষা বস্তুগত ও পরীক্ষামূলক সত্য, তা মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ ফার্দিনান্দ দ্য সসিউরকে সরাসরি

বিরোধিতা করেছেন। আমেরিকায় দুটি দল গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যথা— ক. ইয়েল দল খ. হার্ভার্ড দল।

আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা শুরু হয় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। ব্লুমফিল্ডই প্রথম গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার জন্য একটি দল গঠন করেন। এটি বিভাজন পদ্ধতির প্রয়োগে গঠিত হয়। দলটি মনে করত কথা বলার সময় ভাষাতাত্ত্বিক এককের বিভাজন সূত্র প্রয়োগ করেই আপেক্ষিক সম্পর্কে তথ্য জানা যায়। এই দলটি ছিল নিয়মগত পদ্ধতিতে বিশ্বস্ত। তবে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অর্থের প্রত্যক্ষ যোগাযোগকে এঁরাও বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু দলটি ভাষাতত্ত্বের প্রকৃত উপাদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চায় ক্ষেত্রে দলটির অবদান অনস্বীকার্য।

য়াকবসনও আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখানে এসে ভাষাতত্ত্বের এক নতুন দিক তিনি উন্মোচন করেন। স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যর তত্ত্ব ক্রমাগত আরোপ করেন তিনি ও তাঁর অনুগতরা। তবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভাজনের মানকেও তিনি স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ ব্লুমফিল্ডের ইয়েল দলকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার য়াকবসনের দলটি করেনি। ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য দলটি বিভাজনক পদ্ধতিই অনুসরণ করে। তবে ধ্বনিবিচারের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে দলটি। ব্লুমফিল্ড দলের আদর্শ, শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও বিচার পদ্ধতি অধিকতর সাফল্য পায় এই হার্ভার্ড দলের সৌজন্যেই। সুতরাং আমেরিকায় গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে হার্ভার্ড দলের ভূমিকাও কম নয়।

তবে ইয়েল ও হার্ভার্ড দলের মধ্যে বিরোধ অনেক কমে যায় ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণে ইনফরমেশন থিওরি ও গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে। বর্তমানে আমেরিকার অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে মিশ্র পদ্ধতি ও হার্ভার্ড উভয় দলের পদ্ধতিই অনুসরণ করছেন। যেমন—রূপান্তর ও সৃজনমূলক ব্যাকরণের প্রবক্তা নোয়াম চমস্কি বিভাজন পদ্ধতি, গাণিতিক পদ্ধতি যেমন অনুসরণ করেছিলেন, তেমনি হার্ভার্ড দলকেও গ্রহণ করেছেন। আবার হার্ভার্ড দলের সদস্য মরিসহালে একই সঙ্গে বিভাজন পদ্ধতি ও গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন তাঁর রূপান্তরমূলক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে। থিওরি অব ইনফরমেশনেও বিশ্বাসীও ছিলেন তিনি।

এ ছাড়া চাইনিজ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ইয়েনরেন চাও গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর 'The Non-Unigueness of phonemic solution of phonetic system.'

ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানের গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার আলোচনা থেকে এই ভাষাতত্ত্বের যে দিকগুলি উঠে আসে, তা হল—এখানে ভাষার সাংগঠনিক দিক আলোচিত হয় বস্তুগত বিচারমানের সাহায্যে। শুধু ভাষাবিশ্লেষণ নয়, ভাষার ক্রিয়াগত দিকটিও গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রতিকল্পকের সাহায্যে ভাষার উপাদানেরও ক্রিয়াগত দিক চিহ্নিত করা হয়েছে। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে কোনো সংজ্ঞা, সূত্র আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতীক, সূত্র, নকশা ব্যবহার করা হয়।

৩০১.৩.১১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বলতে কী বোঝো? তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পটভূমি আলোচনা করো।

২। ভারতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস আলোচনা করো।

৩। পাশ্চাত্যের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পরিচয় দাও।

৪। গঠনমূলক ভাষাতত্ত্ব বলতে কী বোঝো? ফের্দিনা দ্য সসিউর থেকে ইরেনরেন অবধি গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পরিচয় দাও।

৩০১.৩.১১.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩) — ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬) — সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭) — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৯৩৬) — রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮) — মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মুজমদার, দেজ পাবলিশিং

৮। 'ভাষা-দেশ-কাল' (২০০০) — পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮) — রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪) — অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১) — নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭) — ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮) —অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান (১৯৯৪) — আশিস দে, পুস্তক বিপণি

————————

একক - ১২
অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও বাহ্যপুনর্গঠন

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৩.১২.১ : অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction)

৩০১.৩.১২.২ : বাহ্যিক পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পুনর্গঠন (External Reconstruction or Comparative Reconstruction)

৩০১.৩.১২.৩ : গ্রীমের সূত্র (Grimm's Law)

৩০১.৩.১২.৪ : গ্রাসমানের সূত্র (Grassman's Law)

৩০১.৩.১২.৫ : ভার্নারের সূত্র (Verner's Law)

৩০১.৩.১২.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০১.৩.১২.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.৩.১২.১ : আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction)

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন যে-কোনো ভাষার প্রাগৈতিহাসিক স্তরের রূপ গঠনের বহু প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন ভাষাবিজ্ঞানী হেরমান গ্রাসমান। এই পদ্ধতি সৃষ্টির পিছনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল, তা হল, যে-কোনো ভাষার মধ্যে সেই ভাষার পূর্ববর্তী স্তরগুলি নিজস্ব কিছু কিছু চিহ্ন বিভিন্ন দিক থেকে রেখে যায়। এই চিহ্নগুলি বিশ্লেষণ করে পূর্ববর্তী স্তরের ভাষারূপটি উদ্ধার করা সম্ভব। এইভাবে যেমন ভাষার পূর্বরূপের পুনর্গঠন করা যায় তেমনি স্তর-পরম্পরায় ভাষার বিবর্তনও লক্ষ করা যায়। গ্রাসমান সংস্কৃত ও গ্রিক ভাষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার করে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুনর্গঠনের পথ দেখান। তাঁর সূত্রানুসারে—প্রত্নইন্দো-ইউরোপীয় (proto-Indo-European) কোনো শব্দের পরপর দুটি ধ্বনি কিংবা পরপর দুটি অক্ষরের (syllable) প্রারম্ভিক ধ্বনি মহাপ্রাণ হলে অথবা কোনো অক্ষরের (syllable) শেষ মহাপ্রাণ ধ্বনিত হলে সংস্কৃত ও গ্রিকে পরপর দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রথমটি এবং অক্ষরান্তের মহাপ্রাণ ধ্বনিটি অল্পপ্রাণে পরিণত হয়। এই সূত্রটিকে 'গ্রাসমানের সূত্র' (১৮৬৩) বলা হয়। যেমন * 'ভোধতি'—এই অনুমিত মূল ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দটিতে পরপর দুটি অক্ষর (syllable)—'ভো' ও 'ধ' দুটি ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' ও 'ধ' দিয়ে শুরু হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটি হয়ে যায় 'বোধতি'। অর্থাৎ দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রথমটি পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ব'-'তে' পরিণত হয়েছে। গ্রিক ভাষা থেকে গ্রাসমান অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন, দুটি গ্রিক শব্দ 'thriks' (চুল) এবং 'trikhos' (চুলের)। প্রথমটি কর্তৃপদ এবং দ্বিতীয়টি সম্বন্ধ পদ। গ্রাসমান

সিদ্ধান্ত করেন প্রাক-গ্রিক শব্দটির আদিরূপ ছিল * 'thrikh'। এই শব্দটির গ্রিকে রূপান্তরিত কর্তৃপদ 'thriks' এ 'kh' অল্পপ্রাণ 'k'—এই মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনটি অক্ষরের শেষে অবস্থিত ছিল। তাছাড়া 'S' যুক্ত হলে পূর্ববর্তী মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হয়। আবার সম্বন্ধপদ 'trikhos'—এ 'th' অল্পপ্রাণ 't' হয়েছে। কারণ অক্ষরের মধ্যে পরপর দুটি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন থাকায় প্রথমটি অল্পপ্রাণ হয়েছে। এই কারণে পরবর্তী মহাপ্রাণ 'kh' এখানে রক্ষিত হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতিতে ধ্বনি সংগঠনের মূলটি অনুসন্ধান করা হয়। কোনো ধ্বনি অপগত হলে আভ্যন্তর প্রমাণ থেকেই উদ্ধার করা যায়। ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দে স্যোসুর লক্ষ করেছেন, অধিকাংশ প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ধাতুর গঠন কাঠামো ব্যঞ্জন-এ—ব্যঞ্জন (c-e-c)। এখানে ব্যঞ্জনটি যে-কোনো হতে পারে। যেমন, 'bher' (c-e-c), 'sed' (c-e-c) প্রভৃতি। সাধারণভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে কিছু সংখ্যক ভিন্ন ধরনের ধাতুরূপের গঠন দেখা যায়। যেমন, এ ব্যঞ্জন (ec-), অ-ব্যঞ্জন (ac-), ও ব্যঞ্জন (oc-), ব্যঞ্জন এ (ce :-), ব্যঞ্জন অ (ca :-) অথবা ব্যঞ্জন ও (co-); শেষের তিনটি সর্বদা দীর্ঘ স্বরধ্বনি। স্যোসুর অনুমান করেন এই ব্যতিক্রমী ধাতুগুলি ব্যঞ্জন—এ—ব্যঞ্জন (c-e-c)—এই সাধারণ গঠনই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সুনিশ্চিতভাবে কিছু প্রত্নব্যঞ্জন ভাষা থেকে লুপ্ত হয়েছে। এই লুপ্ত ব্যঞ্জনগুলি প্রতিবেশী স্বরধ্বনির প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করেছে। এভাবেই এ (e) হয়েছে 'অ' (a) অথবা 'ও' (o)। তারপর সে সবগুলি অন্তর্হিত হয়ে অগ্রবর্তী স্বরধ্বনিটিকে দীর্ঘায়িত করেছে। সমস্ত ব্যতিক্রমী ধাতু যে সুনির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবর্তনের ফল তা এই বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। এই ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র দিয়ে প্রকৃত ধাতুরূপটি পুনর্গঠিত করা যায়। স্যোসুরের এই পর্যবেক্ষণটি 'ল্যারিংজিয়াল হাইপোথেসিস্' (laryngeal hypothesis) নামে খ্যাত। স্যোসুরের সিদ্ধান্ত অবশেষে প্রতিষ্ঠা পায় হিত্তাইট (Hittite) ভাষা আবিষ্কারের পর। কারণ সেখানে এই ধরনের কিছু প্রত্নব্যঞ্জন রক্ষিত ছিল। কুরিলোভিয়েজ (Kurylowieg) হিত্তাইট ভাষা নিয়ে কাজ করে স্যোসুরের মত সমর্থন করেন।

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতিটি কেবলমাত্র ভাষার আভ্যন্তরীণ তথ্যের উপর নির্ভর করে থাকে। আভ্যন্তরীণ তথ্য থেকে কিভাবে পুনর্গঠন হয় তা ভারতীয় ভাষা থেকে দেওয়া যাক। যেমন, ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরের একটি প্রাকৃত 'মাগধী'—তে নলে, লাজা বা 'ধীবল' শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির পূর্বরূপ ভাষার প্রাচীন স্তর থেকে পাওয়া যায়। যথা—'নরঃ', 'রাজা' বা 'ধীবর'। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাগধী প্রাকৃতে র > ল হয়েছে। এবার ধরা যাক, মাগধীতে 'চালু' শব্দটি পেলেও প্রাচীন স্তরে এর কোনো রূপ পাওয়া গেল না। কিন্তু ভাষার অন্যান্য আভ্যন্তরীণ দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই রূপটি পুনর্গঠিত করা যায়। সেটি হবে 'চারু'।

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত রূপটি যে প্রকৃতই পূর্ববর্তী স্তরের ভাষায় ছিল, তা নাও হতে পারে। এই পদ্ধতিতে যথাযথ রূপ যে সব সময়ই গঠন করা সম্ভব হয়, এমনও নয়। ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। যেমন, 'জলদ'—অর্থাৎ যে জল দান করে, 'বারিদ'—অর্থাৎ যে বারি দান করে, 'করদ'—অর্থাৎ যে কর দান করে। এই সাধারণ সাদৃশ্য দেখে 'দ'—এর অর্থ 'দান করা' বোঝা যায়। কিন্তু সেই সাদৃশ্যে 'রুদ' এই শব্দের 'রু' অর্থে 'গতি' বা 'হিংসা' এবং 'দ' অর্থে 'দান করে' ধরলে ভুল হবে। কারণ

'রুদ'— এর অর্থ 'রোদন করা'। একারণেই আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয়।

৩০১.৩.১২.২ : বার্হিক পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পুনর্গঠন (External Reconstruction or Comparative Reconstruction)

বাহ্যিক পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পুনর্গঠন পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক সম্পর্কিত ভাষার সম উপাদানগুলির তুলনামূলক বিচার থেকে ভাষার পূর্ব কালবর্তী রূপের পুনর্গঠন করা হয়। কোনো ভাষাগুলিকে 'সম্পর্কিত' ভাষা বলে ধরা হবে তার কোনো সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করা যায় না। তবে যে ভাষাগুলির মধ্যে শব্দসম্ভারের যথেষ্ট সাদৃশ্য ও 'ব্যাকরণে যথোপযুক্ত মিল' থাকে এবং কিছু ক্ষেত্রে যে ভাষাগুলিতে একই ধরনের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পরিচয় থাকে সেই ভাষাগুলিকেই 'সম্পর্কিত' ভাষা বলা যেতে পারে। রাসমুস রাস্ক এ সম্পর্কে বলেছেন, যদি একাধিক ভাষার মধ্যে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে বা যদি একটি ভাষার ধ্বনি নিয়মিতভাবে অন্য কোনো ভাষায় রূপান্তরিত হতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে ঐ দুটি ভাষা একই উৎসজাত এবং মৌলিক সম্পর্কে অন্বিত।

এই পদ্ধতিতে সম্পর্কিত ভাষাগুলির তুলনা করতে গিয়ে প্রথমে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে তাদের তুলনা করা হয়। এক্ষেত্রে সম্পর্কবাচক শব্দগুলির দিকে প্রথমে লক্ষ করা হয়। পরে পরে অন্য ধরনের শব্দও বিচার্য হয়। একাধিক ভাষার শব্দের মধ্যে যদি রূপগত বা অর্থগত সাদৃশ্য পাওয়া যায় তবে তাদের সহোদর শব্দ (cognates words) বলা যাবে। যেমন, 'ভাই'-বাচক শব্দ সংস্কৃতে—'ভ্রাতার', গ্রিকে—'ফ্রাতের', গথিকে—'ব্রথার', ল্যাটিন 'ফ্রাতের', ইংরাজীতে 'ব্রাদার' এই শব্দগুলি সব 'সহোদর শব্দ'। এইভাবে শব্দসহ বিভিন্ন উপাদানের তুলনামূলক বিচারের সাহায্যে একই বংশের এক স্তরের সহোদর ভাষাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। আরো গভীরে একই স্তরের এক পরিবারভুক্ত ভাষাগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়। একই পরিবারভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে তাদের প্রাচীন মূল রূপ নির্ণয় করা হয়। সেই স্তরের অন্য ভাষা-পরিবারের যে মূল রূপগুলি ছিল তাদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে ভাষার প্রাচীনতর রূপটি সন্ধান করা হয়। এইভাবে, বংশের উৎস-ভাষাতে পৌঁছে তার রূপ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা করা হয়। যেমন, আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া একই পরিবারভুক্ত। এর পূর্ববর্তী স্তরে পূর্বী মাগধী অপভ্রংশ ছিল। এই স্তরে তার সহোদর ভাষা পশ্চিমা মাগধী অপভ্রংশ, এদের পূর্বস্তর মাগধী প্রাকৃত। যার সহোদর ভাষা অর্ধমাগধী। এদের পূর্ব স্তর প্রাচ্য প্রাকৃত। প্রাচ্য প্রাকৃতের সহোদর ভাষা প্রাচ্যমধ্যা। উত্তরা-পশ্চিমা ও দক্ষিণ-পশ্চিমা। এইভাবে ক্রমশ ভাষার উৎসের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তুলনাত্মক পথে এগিয়ে গিয়ে এইভাবে প্রত্নভাষা পুনর্গঠনের পথিকৃৎ আউগুস্ট শ্লেইসার। তিনিই প্রথম প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পুনর্গঠনের প্রয়াস চালান। সহোদর ভাষাগুলির তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে দেখতে হয় একই উপাদান প্রতিটি ভাষায় কি রূপ নিচ্ছে আর সেই পরিবর্তন ধারাবাহিক কিনা। যেমন, ইতালিক ভাষা-পরিবারের লাতিন ভাষায় 'আট' অর্থে একটি শব্দ 'octo' [অক্তো], ফরাসিতে 'huit' [উ্যই(ৎ)], ইতালীয়তে 'otto' [অত্তো], স্পেনীয় 'ocho' [ওৎসো]। তাহলে দেখা যাচ্ছে লাতিনে যা উচ্চারণে 'ক্ত', তাই ফারসীতে 'ইৎ', ইতালীয়তে 'ত্ত', স্পেনীয়তে 'ৎস'। এইভাবে একটি

ভাষার উচ্চারণ যদি অন্যভাষাগুলিতে বারে বারে একই রকম সুশৃঙ্খলভাবে পরিবর্তিত হয় তবে বুঝতে হবে বিষয়টি নিয়মাধীন।

৩০১.৩.১২.৩ : গ্রীমের সূত্র (Grimm's law)

য়্যাকব গ্রীম তাঁর 'ডয়ট্শে গ্রামাটিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে জার্মানিক ভাষাগুলির ধ্বনি-পদ্ধতির সঙ্গে অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি পদ্ধতির তুলনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করেন সেগুলির মধ্যে যে ধ্বনিগত রূপান্তর দেখা যায় তা সুশৃঙ্খল নিয়মাধীন পথেই ঘটে। গ্রীমের পূর্বে রাস্ক জার্মানিক শাখারই প্রাচীন নর্স বা আইসল্যান্ডীয় ভাষার উদ্ভব লক্ষ করতে গিয়ে এই বিষয়টি প্রথম খেয়াল করেন। কিন্তু গ্রীম-ই প্রথম এই ধ্বনি পরিবর্তন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে এসে একটি সূত্র নির্মাণ করেন যাকে তিনি 'Sound shift' বলেছেন, তাই (Gremm's law) নামে পরিচিত। সূত্রটি এইরকম—মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে জার্মানিক ভাষায় ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (voiced aspirated sound) ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে (voiced unaspirated plosive), ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (voiced unaspirated plosive) অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে (voiceless unaspirated plosive) এবং অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (voiceless unaspirated plosive) অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনিতে (voiceless aspirated fricative) পরিণত হয়েছে।

অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় অন্য শাখার জার্মানিকে ধ্বনি পরিবর্তন এইভাবে হয় ঃ

(১) ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি bh, dh, gh

ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি b, d, g

যেমন, ইন্দো-ইউরোপীয় একটি ভাষা সংস্কৃতের 'bhavami' শব্দটির জার্মানিক শাখার গথিক ভাষায় রূপ 'beon', ইংরেজিতে 'be'।

(২) ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি b, d, g—অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শবনি p, t, k

যেমন, সংস্কৃতে 'দশ' বা 'গ্রিকে' 'dcka'-র জার্মানিক শাখার গথিক ভাষায় রূপ 'taihun'।

(৩) অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি p, t, k—অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনি f, θ, x

যেমন, সংস্কৃতে 'পিতৃ' বা গ্রিকে 'pater' শব্দটি জার্মানিক শাখার গথিকে হয়েছে 'fadar'।

গ্রীমের সূত্রে দুটি স্তরে 'sound shifting' এর কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির যে পরিবর্তন তাকে বলা হয়েছে 'first sound shifting'। আর জার্মান ভাষার তুলনায় সপ্তম শতকের কাছাকাছি সময়ে ওল্ড-হাই-জার্মান ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন হল 'Second sound shifting'। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'A' (= Aspirate) অর্থাৎ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনি-bh, dh, gh এবং f, θ, x) জার্মানিক ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে 'M' (= Neduak) এ অর্থাৎ ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে (b, d, g)। সেখান থেকে ওল্ড-হাই-জার্মান ভাষায় হয়েছে 'T' (T = Tamues) অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (p, t, k)। আবার, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়তে 'M' হয়েছে জার্মানিক

ভাষায় 'T' আর ওল্ড-হাই-জার্মানে 'A'। এবং প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়তে 'T' হয়েছে জার্মানিক ভাষায় 'A', ওল্ড-হাই-জার্মানে 'M'।

এই দ্বিস্তরীয় ধ্বনিপরিবর্তনের বিষয়টি একটি ত্রিভুজের সাহায্যে স্পষ্ট করা যায়। (bh, dh, gh এবং f, θ, x)।

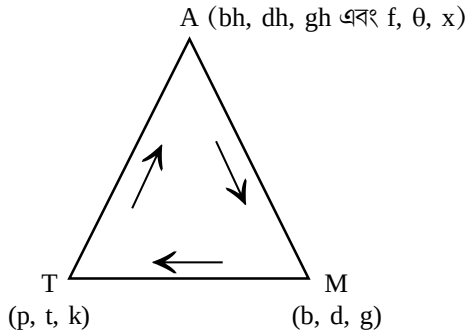

ত্রিভুজের যে-কোনো একটি বিন্দুকে যদি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ধরা হয় তবে পরবর্তী বিন্দুটি হবে জার্মানিক। আর শেষ বিন্দুটি হবে ওল্ড-হাই-জার্মানিক। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ঃ (A) প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় একটি ভাষা গ্রিকে 'thygater' > (M) প্রাচীন জার্মানিক ভাষা গথিকে 'daughter' > (T) ওল্ড-হাই-জার্মানিক ভাষায় 'toher'। পরিবর্তিত ধ্বনি ক্রমটি এরকম θ > d > t।

গ্রীম স্বয়ং তাঁর 'Sound-shifting' তত্ত্বের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমের কথাও বলেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হল—

(i) 'sk', 'st', 'sp'—এসব থাকলে 'S' Sound-shifting-এর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন, সংস্কৃত-asti > গথিক-ist > ওল্ড-হাই-জার্মান-ist

(ii) Kt, pt-এসব থাকলে t অপরিবর্তিত থাকে। যেমন, সংস্কৃত—napta > ওল্ড-হাই-জার্মান—nift এছাড়াও 'Sound-Shifting'—এর ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম—বিচ্যুতি সহজেই লক্ষ করা যায়। যেমন, সংস্কৃতে 'bhratar' (ভ্রাতার) শব্দটি গথিকে হয়েছে 'brodar' (ব্রথার) আর ওল্ড-হাই-জার্মানে হয়েছে 'bruoder' (ব্রুওডার)। গ্রীমের সূত্রানুযায়ী ধ্বনি পরিবর্তন bh > b > p হয়নি।

৩০১.৩.১২.৪ : গ্রাসমানের সূত্র (Grassman's Law)

গ্রীমের সূত্রে অসংখ্য অনিয়মের মধ্যে কয়েকটির প্রতি হেরমান গ্রাসমান দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন এবং সূত্র উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, গ্রিক ও সংস্কৃতে যদি পরপর দুটি অক্ষরের (Syllable) আরম্ভ মহাপ্রাণ ধ্বনিতে হয় তবে প্রথমটির অল্পপ্রাণ উচ্চারণ হবে। যদি দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি একটি অক্ষরের (Syllable) মধ্যে থাকে, তাহলেও প্রথমটি তার মহাপ্রাণতা হারাবে। অর্থাৎ দুটি মহাপ্রাণধ্বনি পাশাপাশি থাকে না। যেমন, সংস্কৃতে dhadhami (ধধামি)-র স্থানে পাওয়া যায় dadhami (দধামি)। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় সংস্কৃতের প্রাথমিক ধ্বনিগুলি ও প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনিগুলি প্রকৃতপক্ষে এক ছিল। গ্রাসমানের এই সূত্রের সাহায্যে গ্রীমের সূত্রের অনেক ব্যতিক্রম যে প্রকৃতপক্ষে ব্যতিক্রম নয় তা ব্যাখ্যা করা যায়।

৩০১.৩.১২.৫ : ভার্নারের সূত্র (Verner's Law)

গ্রাসমানের সূত্রের পরেও গ্রীমের সূত্রের অনেক ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই সমস্যার সমাধানে আসেন ওলন্দাজ ভাষাবিজ্ঞানী কার্ল ভার্নার। তিনি "An exception to first-consonant shift" প্রবন্ধ একটি সূত্র দেন, যা গ্রীমের সূত্রের সংশোধনী-'ভার্নারের সূত্র' (Verner's Law) নামে পরিচিত।

তিনি বলেন, শ্বাসাঘাতের অবস্থানের উপরে 'Sound-shifting' নির্ভর করে। যেমন, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে p, t, k ধ্বনিগুলি গথিকে গ্রীমের সূত্র অনুসারে পরিবর্তিত হয় তখনই, যখন শ্বাসাঘাত এই ব্যঞ্জনগুলির অব্যবহিত পূর্বে পড়ে। কিন্তু যদি শ্বাসাঘাত পরে পড়ে তবে ধ্বনির পরিবর্তন (sound-shift) দ্বি-স্তরীয় হয়ে যায়। অর্থাৎ 'p, t, k' থেকে 'bh, dh, gh' না হয়ে 'b, d, g' হয়ে যায়।

যেমন, সংস্কৃত (প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রতিনিধি)—'Satam' > গথিক (প্রাচীন জার্মান ভাষার প্রতিনিধি), hund, অর্থাৎ 't' ধ্বনি 'dh' না হয়ে 'দ' হয়েছে।

ভার্নারের সূত্রটি সংক্ষেপে এইরকম—

যদি অব্যবহিত পূর্বধ্বনিতে শ্বাসাঘাত না পড়ে তবে শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত আন্তঃস্বরীয় অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনি ঘোষমহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

ধ্বনি সূত্রের সাহায্যে লুপ্ত শব্দের পুনর্গঠন :

গ্রীমের ধ্বনিসূত্র ও তার পরিপূরক গ্রাসমান ও ভার্নারের সূত্রের সহায়তায় লুপ্ত শব্দের পুনর্গঠন সম্ভব হয়। একটি শব্দ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। চতুর্থ শতকে প্রাপ্ত একটি গথিক শব্দ 'fadar'। প্রত্ন জার্মানে শব্দটি সম্ভবত ছিল 'fader'। কারণ অন্য ভাষায় যেখানে 'er', গথিকে শ্বাসাঘাতের অভাবে সেখানে 'ar' হয়। এখন দেখতে হবে 'fader' শব্দটি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কি ছিল।

সূত্র অনুসারে জার্মান ভাষার 'f' = ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা 'p' (সংস্কৃত পিতা, গ্রিক Pater)। দ্বিতীয় ধ্বনি সম্ভবত হ্রস্ব অ (১)। কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় এটিই বেশি ব্যবহৃত মতো। অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় যেখানে 't' থাকে সেখানে জার্মান ভাষায় 'θ' হয়, কিন্তু এখানে ধ্বনিটি শ্বাসাঘাতহীন স্বরধ্বনির পর আসার ভার্নারের সূত্র অনুযায়ী জার্মান ভাষায় 'θ' না হয় 'd' হওয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আর 'θ' বিকল্প 'd' ইন্দো-ইউরোপীয়তে নিশ্চিতভাবে 't' হবে। অন্যান্য সমশব্দ থেকে স্পষ্ট হয় শেষ দুটি ধ্বনি নিশ্চিতভাবে 'e' ও 'r'। তাই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দটির পুনর্গঠিত রূপ কল্পনা করা যায় 'pdter'।

৩০১.৩.১২.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ইউরোপে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভাষাচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাচর্চা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে ভারতে যে ব্যাকরণ চর্চা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো ঃ পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি।

৪। আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতি বলতে কী বোঝো দৃষ্টান্তসহ লেখো।

৫। টীকা লেখো : 'ল্যারিংজিয়াল হাইপোথেসিস্', গ্রাসমানের সূত্র।

৬। বাহ্যিক পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পুনর্গঠন [External Reconstruction or Comparative Reconstruction] পদ্ধতি কি আলোচনা করো।

৭। টীকা লেখো—'সম্পর্কিত ভাষা', 'সহোদর শব্দ'।

৮। গ্রীমের সূত্রটি আলোচনা করো। এই সূত্রে কি ধরনের ব্যতিক্রম দেখা যায়?

৯। 'গ্রাসমানের সূত্র' ও 'ভার্নারের সূত্র' দুটি লেখো। এগুলির প্রয়োজনীয়তা কি ছিল?

১০। ধ্বনিসূত্রের সাহায্যে লুপ্ত শব্দের পুনর্গঠনের উদাহরণ দাও।

৩০১.৩.১২.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আজাদ, হুমায়ুন : তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

২। Lehmann, Winfred P : Historical Linguistics.

৩। Arlotto, Anthony : Introduction to Historical Linguistics.

৪। Giles, P : A short Manual of Comparative Philology.

পর্যায় গ্রন্থ-৪

একক-১৩

উপভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৪.১৩.১ : উপভাষা

৩০১.৪.১৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৪.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.৪.১৩.১ : উপভাষা

ইংরেজিতে 'Dialects' শব্দের বাংলা পরিভাষা হল উপভাষা। পৃথিবীতে যতগুলি ভাষা আছে সব ভাষারই দুটি রূপ আছে। তা হল শিষ্টরূপ ও কথ্যরূপ। বলা যায় কথ্যরূপের উপরই উপভাষার প্রতিষ্ঠা। ফলে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে উপভাষার রূপগত ও ধ্বনিগত একটা পার্থক্য থেকেই যায়। সুকুমার সেন-এর মতে, উপভাষা হল কোনও ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষার ছাদ। উপভাষা সম্পর্কে "A Dictionary of Lingustics"-এ বলা হয়েছে:' A specific form of a given language– spoken in a certain locality or geographic area– showing sufficient differences from the standard or literary form of that language– as to pronunciation– grammatical construction and idiomatic usage of words to be considered a distinct entity– yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language.' এখান থেকে বলা যায় উপভাষা যে কোনও ভাষার একটি আঞ্চলিক রূপ। যা সেই অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। মূল ভাষার সঙ্গে সেই ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত, উচ্চারণগত ও বাক্যগঠনগত পার্থক্য থাকে।পৃথিবীর অন্যান্য বিখ্যাত ভাষার মতো বাংলা ভাষাও উপভাষায় বিভাজিত। বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি এই ভাষাকে বিভিন্ন উপভাষায় বিশ্লিষ্ট করেছে। বর্তমানে বাংলা ভাষার উপভাষা সংখ্যা পাঁচটি। সেগুলি রাঢ়ী, বঙ্গালী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডী ও বরেন্দ্রী।

ভাষা ও উপভাষার সীমারেখাটি খুব অস্পষ্ট। এক উপভাষা থেকে অন্য উপভাষাকে যেমন পৃথকভাবে চিহ্নিত করা শক্ত, তেমনি শক্ত ভাষা ও উপভাষাকে চিহ্নিত করা। তবে ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্য

করা যেতে পারে ভাষা ব্যবহারকারীর ওপর নির্ভর করে। তা ছাড়া উপভাষা সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত নয়। ভাষা যেমন নির্দিষ্ট অঞ্চল বা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে মানুষের জীবন-আচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, উপভাষা তেমন নয়। আবার উপভাষার নির্দিষ্ট রাষ্ট্র যেমন নেই, তেমনি উপভাষা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতও নয়। সামাজিক বা দৈশিক মর্য্যাদা একটা ভাষা পেতে পারে, কিন্তু উপভাষা নয়।

উপভাষা, যে কোনও ভাষার চলিত রূপের ব্যতিক্রমধর্মী উপশাখাভুক্ত ভাষারূপ। এর কোনও লিখিত রূপ নেই। মূলত মুখে মুখেই উপভাষা প্রচলিত। লিখিত রূপ নেই বলে উপভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ বা ব্যাকরণগত নিয়ম শৃঙ্খলা থাকে না। তবে উপভাষার বিভিন্ন রূপ আছে। যেগুলি পঠন ভাষাতত্ত্ব, আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্ব বা ভৌগোলিক ভাষাতত্ত্ব নামে পরিচিত। উপভাষা নির্বাচন হয় আঞ্চলিক শব্দের উচ্চারণগত দিক ও ভাষার মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে। কতগুলি বিশেষ বিশেষ রূপমূলের প্রচলন থেকেই কোনও অঞ্চলের উপভাষাকে চিহ্নিত করা হয়। মূলত মূলভাষার সঙ্গে উপভাষার উচ্চারণগত অনেক পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যই উপভাষাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। এ ছাড়াও শব্দের ব্যবহার, তার অর্থ, প্রবাদ প্রবচন বা অঞ্চল ও সমাজের নানা আচার-বিচার, নীতি-নিয়ম উপভাষাকে মূলভাষা থেকে আলাদা করে রেখেছে। উচ্চারণগত দিকের ক্ষেত্রে উপভাষায় গলার ওঠা নামা বা কথার টান থাকে যা মূল ভাষায় থাকে না। শুধু তাই নয় সামাজিক বিভাগ, পেশাগত দিক, বয়সও উপভাষাকে ভিন্নতা এনে দেয়। আবার অর্থনৈতিক কাঠামো উপভাষাকে অনেক সময় পৃথকভাবে চিহ্নিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। আলাদা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের ভাষাও।

এ ছাড়াও গ্রাম ও শহরের মানুষদের ভাষাও ভিন্ন। উপভাষার স্বরূপ নির্দিষ্ট নয় বলে উপভাষা দ্রুত পরিবর্তনশীল। আর ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধানের জন্য অঞ্চল বিশেষে অনেক উপভাষা সৃষ্টি হতে পারে। এই সব উপভাষার মধ্যে ধ্বনিগত ও উচ্চারণগত প্রভেদ থাকে। তবে মনে রাখা দরকার যারা গ্রামে বাস করে এবং অশিক্ষিত, তারা যদি শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বা অন্য কোনও কারণে পরবর্তী সময়ে শহরে যায়, তাদের ভাষায় সেক্ষেত্রে উপভাষার প্রভাব খুবই কম দেখা যায়। উপভাষা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, অকৃত্রিম। কারণ ব্যাকরণগত কতগুলি নিয়মে এই ভাষা সীমাবদ্ধ নয়। কেবলমাত্র বলা ও শোনার মধ্যেই এই ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এক একটি উপভাষার মধ্যে তারতম্যও নেহাত কম নয়। প্রত্যেকটি উপভাষা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র।

৩০১.৪.১৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'উপভাষা' বলতে কী বোঝ?

২। উপভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৩০১.৪.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

২। হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত : বাঙলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

২। রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৩। পবিত্র সরকার : ভাষা দেশ-কাল

৪। পবিত্র সরকার : বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ

৫। সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

৬। সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

একক-১৪

উপভাষা চর্চার ইতিহাস

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৪.১৪.১ : উপভাষা চর্চার ইতিহাস

৩০১.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০১.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.৪.১৩.১ : উপভাষা চর্চার ইতিহাস

উপভাষা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। উপভাষার চর্চা হয়ে চলেছে। ব্রিটিশ আমলে স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন 'Linguistic Survey of India' (১৯০৩) গ্রন্থে ভারতের নানা উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি মূলত নব্যভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহের উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, অর্থ, উচ্চারণ, শব্দ-গঠন, প্রকৃতি, বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে।

তবে প্রথম দিকে উপভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শব্দবিচারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। আধুনিক দৃষ্টিতে উপভাষা চর্চার সূত্রপাত করেন জার্মান ভাষাবিজ্ঞানী জর্জ ওয়েংকার। ১৮৭৬ সালে Deutscher Sprachatias-এর মাধ্যমে। তিনি কতগুলি বাক্য লিখে জার্মানির নানা স্কুলে ডাকযোগে পাঠান মূলত বাক্যগুলির উপভাষা কী হবে তা জানার জন্যে। এরপর নানা শিক্ষকের কাছ থেকে ও অনেক গ্রাম থেকে বাক্যগুলির উপভাষা কী হবে তিনি তা জানতে পারেন। এবং এ ভাবে তিনি বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। ওয়েংকারের এই উপভাষা সংগ্রহের পদ্ধতি কিছুটা 'ত্রুটিপূর্ণ" ছিল। ওয়েংকারের পর জুল গিল তাঁর "Atlus Linguistique de la France" গ্রন্থে শুয়োংকারের উপভাষা সংগ্রহের পদ্ধতিগত দুর্বলতাকে অনেকটা সংশোধন করেন। তিনি এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর মাধ্যমে বিভিন্ন ফরাসি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে উপভাষা সংগ্রহ করে গবেষণা করেন। এইভাবে তিনি জার্মান উপভাষা থেকে ফরাসি উপভাষার একটা উন্নত মানচিত্র তৈরি করেছিলেন।

জ্যাবার্গ ও জাড নামক দুজন সুইস ভাষাবিজ্ঞানীও উপভাষা চর্চা করেন। তাঁরামূলত ইতালি ও দক্ষিণ সুইজারল্যান্ডের উপভাষা সংগ্রহ করে সেগুলি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। উনিশ শতকে উপভাষাচর্চার ইতিহাসে অন্যতম পথিকৃৎ হলেন জোসেফ রাইট। তিনি তাঁর "English Dialect Dictionary" গ্রন্থে বিভিন্ন

স্কুলের শিক্ষক, ধর্মযাজক ও নানা অঞ্চল থেকে উপভাষা সংগ্রহ করে আলোচনা করেছেন। ইংরেজি উপভাষা নিয়ে চর্চা করেন উনিশ শতকের ভাষাবিজ্ঞানী এ. জে. এলিস। তিনি ইংরেজি ধ্বনিতত্ত্বের নানা দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আবার ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত "English Dialect Society" উপভাষাচর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনে। ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন উপভাষার চর্চা এখানে হয়। আবার গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজির বিভিন্ন উপভাষার চর্চা শুরু হয়েছে।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় "American Dialect Society"। এই সমিতি আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা সংগ্রহ করে উপভাষার মানচিত্র তৈরি করে। আমেরিকার ভাষাবিজ্ঞানী আলডিস রাইট ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা সংরক্ষণ করেন। স্কিট এই সমিতির সেক্রেটারি হলে তিনি গ্রন্থ বিবরণী, শব্দকোষ ইত্যাদির মাধ্যমে উপভাষাচর্চা করেন। আমেরিকার ভাষা বিজ্ঞানী লিওনার্দো ব্লুমফিল্ড, ডেবিট রিড, ল্যাবভ প্রমুখ উপভাষা চর্চায় যুগান্তর আনেন। আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত "লেকল্যান্ড ডায়ালেই সোসাইটি" এবং "ল্যাংকাশায়ার ডায়ালেই সোসাইটি" গদ্য ও পদ্যের উপভাষা নিয়ে গবেষণা করে চলেছে। শেকসপিয়রের সাহিত্যে ব্যবহৃত এমেক্স উপভাষা উত্তর হ্যাম্বারল্যান্ডের উপভাষার ওপর বিস্তৃত আলোচনা করে এই "লেকল্যান্ড ডায়ালেই সমিতি"।

গ্রেট ব্রিটেনে উপভাষাচর্চা শুরু হয় এডিনবরা ও লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপক হ্যারল্ড অর্টন ও জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উপভাষা সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উপভাষা সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপমূল, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দ নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন।

স্কটল্যান্ডের ভাষাতত্ত্ব সমিতি সেলতিক ভাষার পাশাপাশি "লোলাভ স্কটস" নামে পরিচিত একটি ইংরেজি উপভাষা সংগ্রহ করেন। অধ্যাপক এ্যাংগাস ম্যাকিনটোস, কেনেথ জ্যাকসন এবং ডেভিড এ্যাবারক্রমি এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এঁরা এডিনবরার উপভাষা চর্চাও করেন।

আমেরিকার উপভাষাচর্চা নিয়ে আলোচনা হবার পর মধ্য ও দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক স্টেটে উপভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। লোমান "গাই, এস" নামে একটি প্রজেক্ট স্থাপন করে উপভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ম্যাকডেভিড ও কুরাত উপভাষা চর্চায় যুগান্তর আনেন। এঁরা 'দি প্রোনানসিয়েশন অব ইংলিশ ইন দি ইস্ট "ইউনাইটেড স্টেটস"-এর কাজ শেষ করেন। ম্যাকডেভিড, ক্যাসিডি, দক্ষিণ-পূর্ব অন্টারিও, মিশিগান এলিনয়, ওহাই ইত্যাদি অঞ্চলের উপভাষা সংগ্রহ করেন এবং তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আমেরিকার কলেরোডো বিশ্ববিদ্যালয়ের মারজোরি কিমারনে এবং মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিয়ার্স রকি পর্বত অঞ্চলের উপভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ডেভিড রিড, ক্যারল রিড, ডিক্যাম্প প্রমুখ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উপভাষা সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এবং এই সমস্ত উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেন।

অন্যদিকে বাংলা উপভাষা চর্চা নিয়ে বিশেষভাবে কোনও সাড়া প্রথম দিকে পাওয়া যায়নি। মূলত রিভার্সন ভারতীয় উপভাষার বিস্তৃত একটা বিবরণ দেন তাঁর "Linguistics Survey of India" গ্রন্থে। ভারতীয় বিভিন্ন উপভাষার নমুনা সংগ্রহ করে তিনি এখানে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে গ্রিয়ার্সন ছাড়াও বিভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি জেলার আঞ্চলিক উপভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার "বাংলা অকাদেমি"-র উদ্যোগে বাংলা আঞ্চলিক ভাষার একটা অভিধান লেখার চেষ্টাও হয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিশ্লেষণ ও উপভাষাকে জরিপ করে একটা মানচিত্রও তৈরি করে দিয়েছেন।

আধুনিক কালে ভাষার থেকে উপভাষা নিয়েই বিস্তৃত গবেষণা করছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী "নদীয়ার উপভাষা" নিয়ে গবেষণা করেছেন। গোপাল হালদার নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের উপভাষা নিয়ে চর্চা করেছেন। মেদিনীপুরের উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। বাংলাদেশের ভাষাতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ চলিত বাংলার সঙ্গে নোয়াখালির উপভাষার একটা তুলনা করেছেন তাঁর "A study of standard Bengali and the Noakhali Dialect" (১৯৮৫) গ্রন্থে। ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম ড. পৃথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বীরভূমের উপভাষা নিয়ে চর্চা করেছেন। অনিমেষকান্তি পাল পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলের উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। কাঁথি মহকুমার উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন ড. দোলগোবিন্দ দাশ। মালঝিটের উপভাষা সংগ্রহ করে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ড. প্রেমানন্দ প্রধান। ড. শ্যামাপ্রসাদ দত্ত পাঁচ পরগণিয়ার উপভাষা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। ড. মনিরুজ্জামান কুমিল্লা অঞ্চলের উপভাষা সংগ্রহ করে এই ভাষার ধ্বনিমূল ও রূপমূল নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা নিয়ে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের বিস্তৃত আলোচনা লক্ষণীয়। বাংলা ভাষার অন্যতম পাঁচটি উপভাষার মধ্যে কামরাপী উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া বাংলা উপভাষা নিয়ে চর্চা করেছেন ড. শম্ভুচরণ চৌধুরী। ইনি রংপুরের উপভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শুধু উপভাষা নয়, উপজাতিদের ভাষা নিয়েও নানা গবেষণা করেছেন অনেকে। ড. অনিমেষকান্তি পাল সাঁওতালদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায় কগবরক ভাষা বিষয়ে চর্চা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপজাতিদের ভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি ভোটবর্মি ভাষা ও মোগলুম ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। আঞ্চলিক উপভাষা, উপজাতিদের ভাষা নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি সামাজিক উপভাষা নিয়েও বিস্তৃতভাবে চর্চা হয়েছে। বেদের গোত্র, গণ, গ্রাম বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বিশেষভাবে গবেষণা করেন। ড. সুকুমার সেন "নারীর ভাষা" নিয়ে আলোচনা করেছেন। ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক অপরাধ জগতের ভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। পবিত্র সরকারের "ভাষা দেশ কাল" গ্রন্থে সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি বিস্তৃত রূপরেখা পাওয়া গেছে। গোপাল হালদারের প্রবন্ধে 'আদারী ব্যাপারী ভাষার আলোচনা আছে। কলকাতার ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তরুণ ভট্টাচার্য্য। বাংলাদেশের বাঙালিদের ভাষাকে নিয়ে চর্চা করেছেন বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞানী মনিরুজ্জামান। বিহারের রিভাষিকদের ভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ড. মঞ্জুলি ঘোষ। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের নারীদের ভাষা নিয়েও চর্চা করেছেন ড. নির্মল দাশ। এই সমস্ত গ্রন্থে সমাজতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বাংলা পাঁচটি উপভাষা আছে। যেমন রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী। এগুলি নিয়েও ভাষাবিজ্ঞানীরা নানা গবেষণা করেছেন। পবিত্র সরকার কলকাতার বুলি নিয়ে গবেষণা করেছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার উপভাষা নিয়ে চর্চা করেছেন সুভাষ মিস্ত্রি। ইনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা নিয়েও গবেষণা করেছেন। সুন্দরবনের কথ্য ভাষার সাধারণ পরিচয় দেন দিলীপকুমার নাহা। প্রতাপরঞ্জন হাজরা হুগলি জেলার ইতিহাস ও প্রচলিত উপভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। বর্ধমান জেলার লোকভাষা নিয়ে বিস্তৃতভাবে গবেষণা করেন ভব রায়। পুরুলিয়ার জনগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে চর্চা করেন শ্যামাপ্রসাদ বসু। বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত উপভাষার বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন সোমা মুখার্জি (পাল)। বীরভূম জেলার কখনরীতি নিয়ে চর্চা করেন আদিত্য মুখোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদের লোকভাষা এবং কথা বাংলার বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণ ভঙ্গি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন শক্তিনাথ ঝা। নদিয়া জেলায় প্রচলিত উপভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য

কথ্য ভাষাভঙ্গি নিয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেন পবিত্র চক্রবর্তী। পুষ্পজিৎ রায় মালদহ জেলার কথ্যভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণ রীতি, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলা ভাষার উপভাষাগুলির মধ্যে কামরূপী উপভাষা নিয়ে আলোচনা করেন ড. নির্মল দাশ। কোচবিহার জেলার উপভাষার প্রয়োগ ও বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোচনা করেন রণজিৎ বাংলা ও বোড়ো বা মেচ উপভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন উজ্জ্বলকুমার বসুমাতা। জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা বৈচিত্র ও ভাষার কথারীতি নিয়ে গবেষণা করেন সুধীরকুমার বিষ্ণু। টোটো ভাষার সাধারণ পরিচয়, লক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করেন বিমলেন্দু মজুমদার। দার্জিলিং জেলায় প্রচলিত উপভাষার বিন্যাস নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন হরেন ঘোষ। বাংলা ভাষার দিনাজপুরী রূপ ও তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা ধনঞ্জয় রায়। বাংলা উপভাষা নিয়ে চর্চা এখানেই যে থেমে আছে, তা নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে এই চর্চা এখনও হয়ে চলেছে।

৩০১.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) উপভাষা বলতে কী বোঝো? উপভাষা চর্চার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২) ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বাংলা উপভাষা চর্চার স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

৩) উপভাষা সংগ্রহ করার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করো।

৪) উপভাষার স্বরূপ আলোচনা করে উপভাষা কীভাবে জরিপ করা যায় তা বুঝিয়ে দাও।

৩০১.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

২। হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত : বাঙলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

২। রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৩। পবিত্র সরকার : ভাষা দেশ-কাল

৪। পবিত্র সরকার : বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ

৫। সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

৬। সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

একক-১৫

উপভাষা সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপভাষা জরিপ

বিন্যাস ক্রম

৩০১.৪.১৫.১ : ভূমিকা

৩০১.৪.১৫.২ : জরিপকার নির্বাচন

৩০১.৪.১৫.৩ : অঞ্চল নির্দিষ্টকরণ

৩০১.৪.১৫.৪ : প্রয়োজনীয় উপাদান

৩০১.৪.১৫.৫ : প্রশ্নাবলী

৩০১.৪.১৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০১.৪.১৫.১ : ভূমিকা

ভাষার মতো উপভাষারও জরিপ করার প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর যে কোনও ভূ-ভাষার পাশাপাশি উপভাষার প্রয়োজনীয়তা লক্ষণীয়। তার কারণ উপভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা অসংখ্য। তাদের সামাজিকতা, পুজো-আচ্চা, সাংস্কৃতিক কার্য্যাবলী সবই উপভাষায় চর্চা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার বৈশিষ্ট্য যদি আলোচনা করা যায় তবে সেখান থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য্য ধরা পড়ে। বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং উপভাষাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিরূপণের জন্যেই প্রয়োজন উপভাষা সংগ্রহের। দুদিক থেকে উপভাষা সংগ্রহের ব্যাপারটা গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

ক. উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খ. সাংস্কৃতিক আচরণের ভাষাতাত্ত্বিক দিকজরিপের সাত-সতেরো:

ক. জরিপকার নির্বাচন

খ. অঞ্চল নির্দিষ্টকরণ

গ. উপভাষাভাষী মানুষ নির্বাচন

ঘ. প্রয়োজনীয় উপাদান

ঙ. মানচিত্র প্রণয়ন

৩০১.৪.১৫.২ : জরিপকার নির্বাচন

উপভাষা সংগ্রহের জন্যে জরিপকারকে অবশ্যই ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বে জ্ঞানী হতে হবে। তা ছাড়া জরিপ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতিও তার জানা প্রয়োজন। টেপ রেকর্ডার ব্যবহার প্রণালী, প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে দক্ষতা, উপভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে কথা-বার্তার রীতি পদ্ধতি, সময়জ্ঞান সবই জানা দরকার। মনে প্রাণে গবেষককে অবশ্যই কর্মঠ ও উদ্যোগী হতে হবে। একটি বিষয় এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ, গবেষক যে কোনও সময় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়তে পারে। তা সমাধানের মানসিকতা গবেষকের থাকা দরকার। এর সঙ্গে গবেষকের জানা দরকার মূল ভাষার সঙ্গে উপভাষার পার্থক্য সৃষ্টির ক্ষমতা।

৩০১.৪.১৫.৩ : অঞ্চল নির্দিষ্টকরণ

সাধারণত যে সব অঞ্চল বৈচিত্রপূর্ণ বা যে সব স্থানে জরিপ করা হয়নি সেইসব জায়গাকে আগে নির্বাচন করা দরকার। তা ছাড়া যে কোনও উপভাষা অঞ্চলেও জরিপ করা যেতে পারে।

উপভাষাভাষী মানুষ নির্বাচন :

সব শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে উপভাষা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কারণ সকলে উপভাষা অঞ্চলে বসবাস করলেও উপভাষার প্রকৃত রূপ জানে না। যে সব মানুষের সেই অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও বিশেষ যোগাযোগ নেই তাদেরকেই নির্বাচন করা উচিত। মূলত বয়স্ক পুরুষরাই এ ক্ষেত্রে আদর্শ। তবে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা হয়। যেমন উপভাষাগত ত্রুটিহীনতা, স্পষ্ট উচ্চারণ, অবিকৃত কণ্ঠস্বর। এগুলির ব্যত্যয় ঘটলে উপভাষাগত বৈচিত্র পরিবর্তিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নারী, শিশু বা কিশোরদের নির্বাচন করা হয় না। তার কারণ নারীরা রক্ষণশীল, তারা সবকিছু বলতে চায় না। আর শিশু-কিশোরদের অভিজ্ঞতা কম, তারা ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পারদর্শীও নয়।

৩০১.৪.১৫.৪ : প্রয়োজনীয় উপাদান

গবেষককে উপভাষা সংগ্রহ করার তিনটি উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। সেগুলি সেই উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, আঞ্চলিক অভিধান রচনা ও মানচিত্র তৈরি। এগুলি যথাযথ করতে দরকার আদর্শ প্রশ্নমালা, টেপ রেকর্ডার, কাগজ-কলম ইত্যাদি। টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে গবেষক উপভাষাভাষী মানুষের নির্বাচিত কথাসমূহ সংগ্রহ করবেন। অতঃপর সেটি একাধিকবার বাজিয়ে উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য, শব্দ ব্যবহার, বাক্য নির্মাণ ইত্যাদি নিরূপণ করবেন। উপভাষা সম্পর্কিত কী কী নতুন বিষয় গবেষকের গবেষণার মধ্যে পড়ে তা আগে থেকে প্রশ্নমালার আকারে তৈরি করে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে রূপমূল সংগ্রহের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ রূপমূলের ধ্বনিগত, অর্থগত ইত্যাদি পরিবর্তন উপভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রূপমূলের ক্ষেত্রে মূলত মানুষের দেহ সংক্রান্ত, পোষাক পরিচ্ছদ, বাসনপত্র, বৃত্তিগত দিক, খাদ্য, অসুখ-বিসুখ, খেলাধুলো, পুজো-আচ্চা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে টেপ রেকর্ডার ছাড়াও কাগজ-কলম বিশেষভাবে দরকারি। কারণ অনেক বিষয় রেখচিত্রের মাধ্যমে এঁকে রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেগুলি ছাড়াও ভাষাভাষী মানুষের বয়স, লিঙ্গ, পেশা, জাতি, ধর্ম, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদির খুঁটিনাটি লিখে রাখা হয়।ধরা যাক জনৈক ব্যক্তি দুলালচন্দ্র সাহা -এর কথাবার্তায় উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হবে। সেখানে বিবরণ নিতে হবে এইভাবে

১. নাম

২. বয়স

৩. লিঙ্গ

৪. পেশা

৫. ভাষা

৭. ধর্ম

৮. সংস্কার

৯. রেকর্ডিংয়ের স্থান

১০. পিতা-মাতার ভাষা

১১. শিক্ষাগত যোগ্যতা

১২. রূপমূল সংখ্যা

১৩. বিশেষ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

১৪. বিশেষ প্রবণতা

১৫. মূল্যায়ন

এখানে দু"একটি উদাহরণ দিলেই রূপমূল পার্থক্যের ব্যাপারটি বোঝা যাবে। যথাচলিত বাংলাউপভাষার রূপমূল্যায়ন। দুইছেলেদুইডী (বঙ্গালী)- আগম (সূক্ষ্মবেটা (ঝাড়খণ্ডী) সম্পূর্ণই নতুনমধ্যেমদ্দে (কামরূপী)দ (আগম)মানচিত্র প্রণয়ন: উপভাষা সংগ্রহের পর মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে এই গবেষণারশেষ হয়। উপভাষার মানচিত্রে সাধারণত বিশেষ অঞ্চলের উচ্চারণ, বৈশিষ্ট্য, কাজরূপমূলগত পার্থক্য ইত্যাদি নির্দেশিত হয়। এই মানচিত্র তিন ধরনের হতে পারে

১. রূপমূলের বৈষম্যগত মানচিত্র।

২. রূপমূলের ধ্বনির বৈসাদৃশ্যগত মানচিত্র।

৩. ব্যাকরণগত বৈসাদৃশ্যের মানচিত্র।

৩০১.৪.১৫.৫ : প্রশ্নাবলী

১) উপভাষা বলতে কী বোঝো? উপভাষা চর্চার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২) ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বাংলা উপভাষা চর্চার স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

৩) উপভাষা সংগ্রহ করার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করো।

৪) উপভাষার স্বরূপ আলোচনা করে উপভাষা কীভাবে জরিপ করা যায় তা বুঝিয়ে দাও।

৩০১.৪.১৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

২। হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত : বাঙলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

২। রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৩। পবিত্র সরকার : ভাষা দেশ-কাল

৪। পবিত্র সরকার : বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ

৫। সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

৬। সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

একক - ১৬
ভাষাঋণ

বিন্যাস ক্রম :

৩০১.৪.১৬.১ : ভাষা-সংযোগ (Language-Contact)
৩০১.৪.১৬.২ : ভাষাঋণ (Borrowing)
৩০১.৪.১৬.৩ : ভাষাঋণের কারণ
৩০১.৪.১৬.৪ : ভাষাঋণের শর্তসমূহ
৩০১.৪.১৬.৫ : ভাষাঋণের প্রকারভেদ (Kinds of Borrowing)
৩০১.৪.১৬.৬ : প্রক্রিয়া অনুসারে ভাষাঋণ
৩০১.৪.১৬.৭ : উপাদানগত বিচারে ভাষাঋণের প্রকারভেদ
৩০১.৪.১৬.৮ : ভাষাঋণ বিচারের ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩০১.৪.১৬.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৩০১.৪.১৬.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০১.৪.১৬.১ : ভাষা-সংযোগ (Language-Contact)

যদি কোনো কারণে একটি ভাষা অন্য একটি ভাষার সংস্পর্শে এসে একে অপরের উপর এমন প্রভাব ফেলে যে সেই সব ভাষাভাষী মানুষ সচেতন বা অসচেতনভাবে নিজ নিজ ভাষায় অপর ভাষাটির উপাদান ব্যবহার করে বা উচ্চারণভঙ্গি গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে ভাষা-সংযোগ ঘটেছে।

ভাষা-সংযোগ বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। দুটি ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ প্রান্ত এলাকায় একে অপরের সংস্পর্শে স্বাভাবিক নিয়মেই আসে। তখন ভাষা দুটির পারস্পরিক প্রভাব পড়ে, ভাষা-সংযোগ ঘটে। এক ভাষাভাষীর মানুষ অন্য এক ভাষাভাষী গোষ্ঠীকে পরাভূত করে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করলে ভাষা-সংযোগ সম্ভব হয়। একটি ভাষা সম্প্রদায় কোনো কারণে উদ্বাস্তু হয়ে অন্য ভাষা এলাকায় বসতি স্থাপন করলে তাদের ভাষার সঙ্গে নতুন এলাকার ভাষার সংযোগ অবশ্যম্ভাবী হয়। ব্যবসায়িক কারণেও দুটি ভাষার সংযোগ ঘটতে পারে। আধুনিক কালে গণমাধ্যমও ভাষার সঙ্গে ভাষার সংযোগ ঘটাচ্ছে। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো মানুষ তার কথোপকথনে মাতৃভাষার সঙ্গে তাঁর শেখা ভাষার সংযোগের প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

ভাষা-সংযোগের ফলাফল মামুলি পর্যায় থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সাধারণভাবে এক ভাষাভাষী মানুষ সংযোগে আসা ভাষা থেকে সাধারণস্তরে কিছু সংখ্যক শব্দ ঋণগ্রহণ করে। এসবকে বলে ভাষাঋণ (borrowing); এবং যে সব শব্দ গ্রহণ করা হয় সেগুলিকে বলে ঋণ শব্দ (Loan words)। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয় এমন বিষয় বা বস্তুর নাম, যে বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ পরিচিত ছিল না। যেমনভাবে বাংলা ভাষী মানুষ ইংরেজি ভাষা থেকে পেয়েছে ট্রেন, স্টেশন, কম্পিউটার প্রভৃতি। আবার কোনো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ অন্য একটি প্রভাবশালী ভাষার শব্দ ব্যবহার করে নিজের গুরুত্ব ও সম্মান বৃদ্ধি করতে চায়। এভাবেও 'শব্দঋণ' ঘটে থাকে। যেমন হয়েছিল নর্মানদের ইংল্যান্ড জয়ের পর। প্রাচীন ইংরেজি শব্দকে স্থানচ্যুত করে এভাবেই হাজার হাজার নর্মান-ফ্রেঞ্চ শব্দ স্থান করে নেয়। যেমন 'army' শব্দটি দেশীয় ইংরেজি শব্দ 'here' কে সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রকাশক ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করেছে। কিংবা 'andwhta'-কে সরিয়ে দিয়েছে 'face'।

কিন্তু সংযোগের প্রভাব আরো অনেক গভীর হতে পারে। এমনকি ভাষার ব্যাকরণ এবং উচ্চারণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন, 'কেলটিক' ভাষা পরিবারের 'ব্রেটন' ভাষায় ফরাসি ভাষার প্রভাবে অলিজিহ্বা ধ্বনি (uvular sound) 'r' এসেছে এবং নিজস্ব মূলধ্বনি (phoneme) 'h' হারিয়েছে। কারণ ফরাসি ভাষায় 'r' আছে, 'h' নেই। গঠনগত পরিবর্তনেরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। ইথিওপিয়ার সেমেটিক ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলির ক্রিয়া (verb)-কর্তা (subject)-কর্ম-(object)-বাক্যের এই নিজস্ব ক্রম বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে পার্শ্ববর্তী 'কুশীয়' (cushitic) ভাষাসমূহের প্রভাবে। 'কুশীয়' ভাষায় বাক্যক্রম-কর্তা (subject)-কর্ম (object)-verb (ক্রিয়া)।

ভাষা সংযোগের ফলে অনেক সময় 'মিশ্রভাষা' (Mixed Language) সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রধানত ইংরেজি ভাষা ও অল্প পরিমাণে স্পেনীয় ও পর্তুগিজ ভাষার উপাদান মিশ্রিত হয়ে মিশ্রভাষা বীচ-লা-মার সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজি ও চিনা ভাষার মিশ্রণে নতুন ভাষা হয়েছে 'পিজিন'। অবশ্য সব সময় মিশ্রভাষার সৃষ্টি হয় না। আসতে পারে দ্বি-ভাষিকতা (Billingualism), বহুভাষিকতা (multi-lingualism)।

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষা, তা প্রাচীন বা আধুনিক যে কালেই হোক, অন্য কোনো ভাষার সংযোগের চিহ্ন বহন করে। এমনও দেখা যায়, এক চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ভাষা-সংযোগের কারণে একটি ভাষা তার নিজস্ব ভাষাভাষীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। তারা মাতৃভাষা ছেড়ে প্রভাবশালী ভাষাটি গ্রহণ করেছে। এই ভাষা পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষাটি লোপ পায়। একেই ভাষামৃত্যু (Language death) বলে। যেমন, কেলটিক শাখার 'কর্নিশ' ভাষাটি লুপ্ত হয়েছে। ভাষাভাষীরা গ্রহণ করেছে ইংরেজি ভাষা।

৩০১.৪.১৬.২ : ভাষাঋণ (Borrowing)

য়্যাকব গ্রীমের ধ্বনিসূত্রের পরিপূরক রূপে গ্রাসমান ও ভার্নারের সূত্র নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রীমের সূত্রের সব ব্যতিক্রমগুলি ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়নি। নব্যব্যাকরণবিদেরা ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেই সব ব্যতিক্রমের পুনর্বিচারে ভাষাঋণ (borrowing) এর দিকে দৃষ্টি দেন।

যখন দুটি ভাষাভাষী গোষ্ঠী কোনো কারণে একে অপরের সংস্পর্শে আসে তখন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে একটি ভাষা অন্য ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে যদি স্বীকরণ করে নেয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে ভাষাঋণ (borrowing) বলে। এই প্রক্রিয়ায় যে ভাষা থেকে উপাদানটি গ্রহণ করা হয় তাকে দাতা ভাষা (donor language) এবং যে ভাষা উপাদানটি গ্রহণ করে তাকে গ্রহীতা ভাষা (borrowing language) বলে। যে উপাদানটি গ্রহণ করা হয় তাকে গৃহীত আদর্শ (model) বলে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে 'ঋণ' বা 'দান' শব্দটিতে অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন। যেমন ভাষাবিজ্ঞানী হগেন। কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, এই উপাদান গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তমর্ণের সম্মতির প্রয়োজন হয় না, সে ভাষার কোনো ক্ষতি হয় না, বা ঋণ পরিশোধের কোনো ব্যাপার থাকে না। কিন্তু অন্য বিষয়ে ঋণের ক্ষেত্রে এই দিগগুলির কোনোটি কোনোটি থাকে।

৩০১.৪.১৬.৩ : ভাষাঋণের কারণ

দুটি ভাষাভাষী গোষ্ঠী ভৌগোলিক অবস্থানের কারণ, ব্যবসায়িক সূত্রে, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে, রাজনৈতিক কারণে পরস্পরের সংযোগে আসতে পারে। তখন একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষাটি নিজের ঘাটতি পূরণের জন্যে, মানোন্নয়নের জন্যে ভাষাঋণ করতে পারে। অনেকক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সহজে উচ্চার্য, সমার্থক উপাদান গ্রহণের কারণেও ভাষাঋণ হয়। অনেকক্ষেত্রে একটি ভাষার কোনো কোনো শব্দ বহু ব্যবহারের কারণে ক্লিশে হয়ে যায়। তখন তার বিকল্প পেতে ভাষাঋণ একটি প্রধান উপায়। যেমন, 'দাবি' ব্যবহার না করে 'demand' বা 'claim' শব্দ বাংলাভাষীদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়।

৩০১.৪.১৬.৪ : ভাষাঋণের শর্তসমূহ

প্রথমত : ভাষাঋণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ভাষা সংযোগ। মূলত দুটি ভাষা সংলগ্ন ভৌগোলিক এলাকায় থাকলে ব্যবসায়িক কারণে কিংবা রাজনৈতিক অধিকারের কারণে এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অন্য কোনো ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করলে এই ভাষা সংযোগ হয়। এছাড়া ভাষা সংযোগের অন্যান্য অনেক কারণ আছে। কিন্তু যে ভাবেই হোক, ভাষা সংযোগ ঘটলে তবেই ভাষাঋণ সম্ভব। যেমন, ইংরেজরা প্রথমে ব্যবসায়িক কারণে ও পরে রাজনৈতিক কারণে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল বলেই বাংলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার সংযোগে আসে। ফলে ভারতীয় ভাষাগুলি অনেক পরিমাণে এবং অন্যদিকে ইংরেজি এই ভারতীয় ভাষাগুলি থেকে কিছু পরিমাণে ভাষাঋণ গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়ত : ভিন্ন ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণের মনোভাব (motive) ভাষাঋণের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। হকেট মনে করেন এই মনোভাব (motive) সামাজিক সম্মানলাভের এবং অভাব পূরণের কারণে হয়ে থাকে। এছাড়া ভাষায় অভিনবত্ব আনার মনোভাবও এর পিছনে থাকতে পারে। সামাজিক সম্মান লাভের জন্যে বাংলাভাষীরা প্রায়ই ইংরেজি ভাষা থেকে ঋণকৃত ইংরেজি শব্দ বলে। যেমন, আজকাল 'ব্যবসায়ী' পরিচয় না দিয়ে অনেকে 'বিজনেস ম্যান' বলেন। অভাব পূরণের জন্যে বাংলাভাষায় 'রোমান্টিক'-এর মতো ভাববাচক, 'ট্যাক্সি'-র মতো

বস্তুবাচক প্রভৃতি শব্দ ইংরেজি ভাষা থেকে ঋণ করা হয়েছে। অভিনবত্ব আনার কারণে বাংলা ভাষায় হিন্দী ভাষা থেকেও শব্দঋণ নেওয়া হয়েছে। যেমন, 'আবহাওয়া'-র স্থানে 'বাতাবরণ', 'অনবরত'-র স্থানে 'লাগাতার' ইত্যাদি।

৩০১.৪.১৬.৫ : ভাষাঋণের প্রকারভেদ (Kinds of Borrowing)

ভাষাঋণ প্রধানত দু-ধরনের হতে পারে—অবিমিশ্র ঋণ (Unmixed Borrowing) ও মিশ্র ঋণ (Mixed Borrowing)। কোনো ভাষার উপাদান অবিমিশ্রভাবে অন্যভাষায় গৃহীত হলে তাকে অবিমিশ্র ঋণ বলে। যেমন, 'প্রভিডেন্ট ফান্ড', 'পেনশন', 'ওভারব্রীজ', 'প্ল্যাটফর্ম' ইত্যাদি শব্দগুলি ইংরেজি থেকে অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে। সে কারণে এগুলি অবিমিশ্র ভাষাঋণ। আবার, যদি কোনো ভাষায় অন্য ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে তার অংশবিশেষের সঙ্গে নিজস্ব উপাদান জুড়ে দেওয়া হয় তবে সে ঋণ প্রক্রিয়াকে মিশ্র ভাষাঋণ (mixed Borrowing) বলে। যেমন, ইংরেজি 'প্রফেসর'-এর সঙ্গে বাংলা 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে বাংলা ভাষার শব্দ হয়েছে 'প্রফেসারী'। কিংবা ফারসি উপাদান 'ফি' সংযোগে বাংলায় 'ফি-বছর' শব্দ ইত্যাদি। এই ধরনের শব্দগুলি ভাষার সঙ্কর শব্দ (Hybrid word) রূপে চিহ্নিত।

৩০১.৪.১৬.৬ : প্রক্রিয়া অনুসারে ভাষাঋণ

এছাড়া কোনো প্রক্রিয়ায় উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিচারেও ভাষাঋণের শ্রেণিকরণ করা যায়।

(১) **প্রত্যক্ষ ঋণ** (Direct Borrowing) : এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় উপাদান যখন সরাসরি অবিকৃতভাবে গৃহীত হয় তখন তাকে প্রত্যক্ষ ঋণ বলে। যেমন, 'ইউক্যালিপটাস', 'রেল', 'ফুটবল' ইত্যাদি শব্দগুলি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রত্যক্ষ ঋণ।

(২) **সাহজিক ঋণ বা আত্মস্থীকৃত ঋণ** (Naturalised or Adopted Loan) : এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় উপাদান যদি এমনভাবে গৃহীত হয় যে উপাদানটি দ্বিতীয় ভাষার গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যায়, তার প্রকৃত স্বরূপটিও বোঝা না যায়, তবে তাকে সাহজিক ঋণ বা আত্মস্থীকৃত ঋণ (Naturalised or Adopted Loan) বলে। এই ধরনের উপাদানগুলিকে তখন গ্রহণকারী ভাষার নিজস্ব শব্দ বলে মনে হয়। যেমন, ইংরেজি 'Lord' > বাংলা 'লাট', ইংরেজি 'Hospital' > বাংলা-হাসপাতাল, ইংরেজি 'sentry' > বাংলা-'সান্ত্রী' ইত্যাদি।

(৩) **অনূদিত ঋণ** (Loan translation) : অনেক সময় একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষা শুধুমাত্র শব্দ নয়, শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ, এমনকি বাক্যকে পর্যন্ত প্রথম ভাষার গঠনরীতির অনুসরণে নিজস্ব উপাদানের সাহায্যে অনুবাদ করে নেয়। ফলে এমন হয়, মূল উপাদানটি গ্রহণকারী ভাষারই হয়, কিন্তু গঠনরীতিটি হয় প্রদানকারী ভাষার। এই ধরনের ঋণকে

অনূদিত ঋণ বলে। যেমন, ইংরেজি 'wrist-watch' থেকে 'হাতঘড়ি', ইংরেজি 'University' থেকে 'বিশ্ববিদ্যালয়', 'টেলিফোন' থেকে 'দূরভাষ' ইত্যাদি শব্দ বাংলা ভাষায় অনূদিত ঋণ।

(৪) **অর্থ পরিবৃত্তি** (Loanshift) : যখন কোনো ভাষা অন্য একটি ভাষার নতুন কোনো জিনিস বা ভাববিষয়ক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোঝে, তখন যদি গ্রহীতা ভাষা দাতা ভাষার শব্দটি গ্রহণ না করে নিজস্ব কোনো অপ্রচলিত বা পুরানো শব্দকে তার বর্তমান অর্থ থেকে বিচ্যুত করে নতুন জিনিস বা ভাবটি প্রকাশের প্রয়োজনে ব্যবহার করে তবে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থপরিবৃত্তি বলে। যেমন, 'Radio' বস্তুটির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ 'আকাশবাণী'-র মূল অর্থ 'দৈববাণী'-কে গুরুত্বহীন করে দিয়ে 'রেডিও' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। একইভাবে 'Citizen' অর্থে, নাগরিক, 'Chancellor' অর্থে 'আচার্য' ইত্যাদি।

(৫) **উচ্চারণ ঋণ** (Pronounciation Borrowing) : যখন একটি ভাষার কোনো উপাদানের উচ্চারণ ভঙ্গি অনুসরণে আরেকটি ভাষার একই অর্থপ্রকাশক উপাদানের উচ্চারণ পরিবর্তিত হয় তখন তাকে উচ্চারণ ঋণ বলে। অর্থাৎ দাতা ভাষার উপাদানটি ঋণ করা হয় না, কেবলমাত্র তার উচ্চারণ ভঙ্গিটি ঋণ করা হয়। যেমন, 'সংস্কৃত' শব্দটি ইংরেজি ভঙ্গিতে অনেক সময় উচ্চারণ করা হয় 'স্যাংস্কৃৎ'। এটি উচ্চারণ ঋণের দৃষ্টান্ত। 'রায়' পদবীকে 'রয়', 'বর্ধমান'-কে 'বার্ডওয়ান', 'মেদিনীপুর'-কে মিড্‌নাপুর' উচ্চারণ ইত্যাদিতে আছে ইংরেজি উচ্চারণভঙ্গি। তাই এগুলিও উচ্চারণ ঋণ।

৩০১.৪.১৬.৭ : উপাদানগত বিচারে ভাষাঋণের প্রকারভেদ

যে-কোনো ভাষা ধ্বনি থেকে বাক্য, শব্দসম্ভার থেকে সম্পূর্ণ ব্যাকরণগত কাঠামোতে যেমন তার পূর্ববর্তী ভাষাস্তরের উত্তরাধিকার থাকে তেমনি থাকে অনেক কৃতঋণ উপাদান। এই কারণে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান থেকে বৃহত্তর উপাদান পর্যন্ত বিচার করে ভাষাঋণের প্রকারভেদ করা যায়। যথা—

(১) **শব্দগত ঋণ** : ভাষার উপাদানগুলির মধ্যে শব্দগত ঋণই সবচেয়ে বেশি। পূর্ব আলোচনায় তার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এই শব্দগত ঋণ বিভিন্ন পথে হতে পারে :

(ক) সাংস্কৃতিক শব্দঋণ : এক ভাষাগোষ্ঠী অন্য ভাষাগোষ্ঠীর দ্বারা সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রভাবিত হলে সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শব্দও গ্রহণ করে। একেই সাংস্কৃতিক শব্দঋণ বলে। যেমন, বাংলায় ইউরোপীয় বিশেষত ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে বেশ কিছু ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক শব্দ। যেমন, আধুনিক যান্ত্রিক উপাদানের নাম শব্দ—টেলিভিশন, টেলিফোন ইত্যাদি। প্রশাসনিক শব্দ—মিনিস্টার, অ্যাডভোকেট, মেয়র ইত্যাদি। ধর্মীয় শব্দ—চার্চ, বিশপ, ব্যাপটাইজ ইত্যাদি।

(খ) জ্ঞান জাগতিক শব্দ ঋণ : যে সব শব্দ বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনে খুব সচেতনভাবে একটি ভাষা থেকে অন্য একটি ভাষায় গৃহীত হয় সেই শব্দগুলিকে জ্ঞান জাগতিক শব্দঋণ (Learned Words Loan) বলে। বিশেষত বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যেমন—'হাইড্রোজেন', 'প্রোটন', 'ইলেকট্রন' ইত্যাদি। এছাড়া 'স্যোসালিজম্', 'অ্যানথ্রোপলজি' ইত্যাদি শব্দও এই শ্রেণির। এই ধরনের ঋণকৃত শব্দ সাধারণত সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে না।

(২) **ধ্বনিগত ভাষাঋণ** : একটি ভাষা যদি অন্য কোনো ভাষা থেকে মূলধ্বনি (phoneme), যুক্তধ্বনি, এমনকি ধ্বনি ব্যবহার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তবে সেই বিষয়টিকে ধ্বনিগত ভাষাঋণ বলে। এ ধরনের ঋণগ্রহণ খুব বেশি হয় না। তবে দৃষ্টান্ত যে দুর্লভ তা নয়। যেমন, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এক সময় মূর্ধণ্যধ্বনি ছিল না। পরে অন্য ভাষা বাংলা থেকে ধ্বনিটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় গৃহীত হয়। ইংরেজিতে 'sk'—এই যুক্তব্যঞ্জনটি পূর্বে ছিল না। পরে স্ক্যান্তিনেভিয়ান ভাষা থেকে এই যুক্তব্যঞ্জনটি এসেছে। কোনো দেশের সরকারি প্রধান ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য অপ্রধান ভাষার উচ্চারণরীতিতেও সহজেই এসে যায়। যেমন, হিন্দী ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিতে বাংলা ভাষার 'বন্ধ' হয়ে যায় 'বন্ধ্'।

ধ্বনিগত ঋণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ঋণ অধমর্ণ ভাষার কতকদের সব স্তরে সমানভাবে হয় না। কথকদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ও উচ্চারণে দক্ষ তারা একরকমভাবে আর যারা অশিক্ষিত বা অদক্ষ তারা নিজের মতো করে ঋণগ্রহণ করে। যেমন, ইংরেজি 'violin' শব্দটি জাপানি ভাষী ইংরেজি জানা লোক বলে 'vairin'। যদিও তাদের নিজস্ব জাপানি ভাষায় 'v' ধ্বনিটি নেই। আর যারা কম শিক্ষিত লোক তারা 'v'-র পরিবর্তে হয় 'w' বা 'b' ব্যবহার করে। শব্দটি তারা উচ্চারণ করে 'wairoin' বা 'baiorin'।

(৩) **রূপগত ভাষাঋণ** : রূপগত ভাষাঋণও পরিমাণে কম দেখা যায়। রূপগত ভাষাঋণ বলতে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি গ্রহণকে বোঝানো হয়। বাংলা ভাষায় এমন ধরনের ঋণ সহজেই দেখা যায়। 'আনা', 'গর', 'দান', 'বাজ' ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি ফারসি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে।

(৪) **বাক্যগত ভাষাঋণ** : বাক্যগঠনে কোনো একটি ভাষার বিশেষ রীতি যদি আরেকটি ভাষায়-প্রভাব ফেলে বা সম্পূর্ণ গৃহীত হয় তবে তাকে বাক্যগত ভাষাঋণ বলা যায়। যেমন, ইথিওপিয়ার সেমেটিক ভাষাগুলির কোনো কোনোটির বাক্যগঠনের (ক্রিয়া-কর্তা-কর্ম) নিজস্ব পদ্ধতি পার্শ্ববর্তী কুশীয় (cushitic) ভাষাসমূহের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা বাক্যের গঠনে ইংরেজি বাক্যগঠন প্রণালীর প্রভাব স্পষ্ট। পরে তা কমে এলেও সে প্রভাব থেকে মুক্তি ঘটেনি। 'এবং' দিয়ে বাক্যের আরম্ভ, অব্যয় পদকে ক্রিয়ার পরে বসানো, ইংরেজির মতো খণ্ডবাক্য (clasue) সজ্জাপ্রয়োগ—এসব বাক্যগত ভাষাঋণের নিদর্শন।

৩০১.৪.১৬.৮ : ভাষাঋণ বিচারের ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ভাষাঋণের নিদর্শন সূত্রে ভাষাতত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক অনেক সিদ্ধান্তে আসা যায়। বিশেষত যে সব ক্ষেত্রে 'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ' (intimate borrowing) হয়। 'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ' বলতে বোঝায় একই ভৌগোলিক ভূখণ্ডে বসবাসকারী এবং একই শাসনাধীন জনসম্প্রদায়ের এক ভাষাগোষ্ঠী থেকে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাঋণ। এই ধরনের ভাষাঋণে অনেক সময় ক্ষমতাশালী বা রাজভাষাটি (upper language) অধীনস্থ ভাষাগোষ্ঠীর (lower language) ভাষা হয়ে যায়। আর অধীনস্থ ভাষাটি লুপ্ত হয়ে যায়। ক্ষমতাশালী ভাষাটিতে অধীনস্থ ভাষার বেশ কিছু চিহ্নও থেকে যায়। একারণেই আমেরিকার ইংরেজিতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া একাধিক রেড ইন্ডিয়ান ভাষার ছাপ থেকে গিয়েছে। বিশেষত স্থান নামে। যেমন—ম্যাসাচুসেট্স, মিচিগান, চিকাগো প্রভৃতি। কেলটিকদের ভূখণ্ড ইংরেজরা অধিকার করলে তাদের অধিকাংশ লোক ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করে। কিছু কেলটিক ভাষা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বেশ কিছু স্থান-নামে কেলটিক শব্দ থেকে গিয়েছে। যেমন, লন্ডন, টেমস্, ডোভার প্রভৃতি। এইসব ভাষাঋণের সূত্রে ভাষাবিজ্ঞানীরা লুপ্ত ভাষাগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারেন। ভাষাগুলির লুপ্তিকাল নির্ণয় করতে পারেন। ভাষা সংযোগের কালও নির্ণয় করতে পারেন। আবার হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির পরিচয়, বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার শুরুর ইতিহাসও জানা যেতে পারে। যেমন, ইংরেজরা কেলটিক ভাষীদের সংস্পর্শে এসে 'Cake' শব্দটি পেয়েছে। সিদ্ধান্ত করা যায় তার পূর্বে ইংরেজরা 'Cake' ব্যবহার করত না।

'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ' ছাড়াও দুটি ভাষা এলাকার সংলগ্নতা বা দুটি ভাষার ব্যবসায়িক রাজনৈতিক সম্পর্কেও ভাষাঋণ হয়। যদিও তাতে 'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ' এর মতো ভাষা লোপ করে দেবার ঘটনা সাধারণত ঘটে না। তবে এই ধরনের ভাষাঋণ বিচার করে কোনো ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্ক নিকট, কোন্ কোন্ ভাষার সংযোগ বেশি ছিল বা আছে, তা বোঝা যায়। যেমন, বাংলা ভাষায় তামিল ভাষার চেয়ে হিন্দী ভাষা থেকে ভাষাঋণ অনেক বেশি। এর থেকে অনুধাবন করা যায় বাংলা ও হিন্দী ভাষার সংযোগ এবং আদানপ্রদান বাংলা ও তামিল ভাষার মধ্যে সংযোগ এবং আদানপ্রদানের চেয়ে বেশি। এই সমস্ত প্রকৃতির ভাষাঋণ থেকেই ভাষাগুলির আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায়। একভাষা থেকে আরেক ভাষায় নিয়মিত ধ্বনি পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

৩০১.৪.১৬.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'ভাষা-সংযোগ' কী আলোচনা করো।

২। টীকা লেখো—'মিশ্রভাষা', 'ভাষামৃত্যু', 'শব্দঋণ', ভাষা-সংযোগে ভাষার গঠনগত পরিবর্তন।

৩। প্রক্রিয়াগতভাবে ভাষাঋণ কত প্রকারের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৪। টীকা লেখো : প্রত্যক্ষ ঋণ, আত্মস্থীকৃত ঋণ, অনূদিত ঋণ, অর্থ পরিবৃত্তি, উচ্চারণ ঋণ।

৫। উপাদানগতভাবে ভাষাঋণ কতপ্রকার আলোচনা করো।

৬। টীকা লেখো : শব্দগত ঋণ, ধ্বনিগত ঋণ, রূপগত ঋণ, বাক্যগত ঋণ।

৭। ভাষাঋণ বিচারের ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

৮। টীকা লেখো : 'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ', ভাষাঋণের বিচারে ভাষা সংযোগের সিদ্ধান্ত।

৩০১.৪.১৬.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আজাদ, হুমায়ুন : তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

২। Lehmann, Winfred P : Historical Linguistics; An Introduction.

৩। Arlotto, Anthony : Introduction to Historical Linguistics.

৪। Giles, P : A short Mankal of Comparative Philogy.

৫। Hagun, Einar : Analysis of Linguistic Borrowing; Collected in the P Ecology of Language.

৬। Ullmann, Stephen : The Principals of Semantics.